সাগর পারের রূপকথা

মানসী বড়ুয়া

BBC

পা

সা র রে

গ র

রূ প ক থা

মানসী বড়ুয়া

সাগরপারের রূপকথা

বি বি সি লণ্ডন থেকে প্রচারিত

বি বি সি ও দে'জ পাবলিশিং

Sāgarpārer Rūpkathā
as broadcast from B B C London
Compiled by Mrs. Manasi Barua
a B B C – Dey's Publishing venture.

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ১৩৯২ । জানুয়ারি ১৯৮৬

প্রচ্ছদ : দেবব্রত ঘোষ
প্রচ্ছদের ছবি : সরোজ বড়ুয়া
(সেল্‌ফ্ রিজেস্, লণ্ডন-এর সৌজন্যে)
অলঙ্করণ : মানসী বড়ুয়া

দাম : বারো টাকা

বি বি সি, লণ্ডন-এর পক্ষে জিল্‌স্ নীল ও সুধাংশুশেখর দে কর্তৃক দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩ থেকে প্রকাশিত ও শিবনাথ পাল কর্তৃক প্রিন্টেক, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা ৪ থেকে মুদ্রিত।

সূচি

বালিবুড়ো ৯

খরগোশ আর সজারু ১৪

বোকা চাষী বৌ ১৯

রাজা তেলেদাড়ি ২৫

হ্যানসেল আর গ্রেটেল ৩১

সাতকুঁড়ে ৩৮

রামপুটিতিন ৪২

লাল শেয়াল আর পাঁশুটে নেকড়ে ৫০

দুষ্টু যাদুকর ৫৫

ব্যাঙ রাজকন্যা ৬০

গাধা লাঠি রবিন ৬৫

পরীরাজার উপহার ৭২

জোরিণ্ডা আর জোরিণ্ডেল ৭৭

বারো রাজকুমারী ৮৩

দুই বামন ৮৯

সূচনা

সারা পৃথিবীতে বি বি সি-র পরিচয় সংবাদ প্রচারের জন্যে, বি বি সি নামটি প্রধানত জড়িয়ে আছে গুরুত্বপূর্ণ গভীর সব বিষয়—বিশেষ করে কোন দেশের পক্ষে যে সব বিপর্যয়কর ঘটনা খুব তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেগুলোর দ্রুত নির্ভুল সংবাদ প্রচারের জন্যে। কাজেই এটা হয়তো অবাক লাগে যে বি বি সি বাংলা বিভাগের অন্যতম জনপ্রিয় অনুষ্ঠান, সাপ্তাহিক ছোটদের আসর 'কাকলি' প্রযোজনা করা হয় শিক্ষামূলক করে, অনেকক্ষেত্রে বেশ ভারী ভারী বিষয় বেছে নিয়ে, কিন্তু সবসময় এই অনুষ্ঠানকে করা হয় বিনোদনমূলক, আনন্দপূর্ণ। এই ছোটদের অনুষ্ঠানে মানসী বড়ুয়ার আবহমানকালের গল্পগাথা, উপকথা, রূপকথা বলার অনুষ্ঠান এক বিপুল সংখ্যক শ্রোতাদের আকর্ষণ করে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ভারত বাঙলাদেশের হাজার হাজার শ্রোতাদের কাছ থেকে আসা চিঠি থেকে। আমি নিজেও দেখেছি বাঙলাদেশের দক্ষিণপ্রান্তে প্রত্যেক শুক্রবার সন্ধেবেলা গ্রামের এক একটা শর্টওয়েভ রেডিওর সামনে কুড়ি তিরিশটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে বড়ো বড়ো চোখ করে শুনছে মানসীদির গল্প বলা, মুখ তাদের বিস্ময়ে হাসিতে ভরে গেছে—অবাক হয়ে তারা শুনছে মানসীদি কেমন করে একাই একশো—কখনো পুরুষকণ্ঠে, কখনো নারীকণ্ঠে, কখনো পশুপাখির গলায় কথা

বলছে, নানান ডাক ডেকে উঠছে। অদ্ভুত বিচিত্র কণ্ঠে মজাদার সব মুহূর্ত তৈরী করে মাতিয়ে তুলছে তাদের মানসী। এই বইয়ের পাঠকরা তাঁর কণ্ঠস্বরের সেই বিপুল বৈচিত্র্যের স্বাদ পাচ্ছেন না ঠিকই কিন্তু তার বদলে পাচ্ছেন মানসী বড়ুয়ারই আঁকা জীবন্ত মজাদার ছবি গল্পগুলোর সঙ্গে।

এই বইয়ের জন্যে যে-গল্পগুলো বেছে নেওয়া হয়েছে তার অনেকগুলোই শত শত বছরের পুরনো এবং মায়েরা যুগ যুগ ধরে ছোটদের নানাভাবে শুনিয়ে আসছেন। এই গল্পগুলো য়ুরোপের, অনেকগুলোই নেওয়া হয়েছে গত শতাব্দীর গ্রিম ভাইদের সংগৃহীত রূপকথার ঐশ্বর্য থেকে, কিন্তু এর বিষয়বস্তু আর চরিত্রগুলোর সাদৃশ্য পাওয়া যাবে সারা বিশ্বের লোকপ্রিয় আবহমান গল্পগাথায়। এই গল্পগুলো পড়তে পড়তে এ কথা নিশ্চয় মনে হবে যে বড়োরা এই আশাহত বিশ্বে যতই ভেদবিভেদ সঙ্ঘর্ষ ডেকে আনুক না কেন দেশে দেশে ছোটরা সবসময়ই বাস করে তাদের স্বপ্ন ও কল্পনার জগতে—সেখানে সাহসী রাজকুমার, সুন্দরী রাজকন্যে, ফুলের বনে পরীরা আসে যায়, পশুপাখিরা কথা বলে, দুষ্টু ডাইনীদের শাস্তি হয়—সবার শেষে নেমে আসে শান্তি আর আনন্দ—মানে এক কথায় সেই এক পৃথিবী যা এই গল্পগুলোতে ফুটে উঠেছে।

বাঙলা বিভাগ
বি বি সি

জন রেনার
অনুষ্ঠান সংগঠক

বালিবুড়ো

ছোট্ট টম্‌কে মা রোজ রাত্তিরে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলতেন, "লক্ষ্মী হয়ে ঘুমিয়ে পড়ো টম। লক্ষ্মী ছেলে হলে বালিবুড়ো এসে খুব ভালো ভালো গল্প বলবে।"

একদিন চোখ গোল গোল করে টম মাকে জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা মা বালিবুড়ো কোথায় থাকে ? কে সে ?" – "বারে বালি-বুড়োকে জানিস্ না বুঝি ?" – মা বললেন – "সমুদ্রের ধারে রাতের বেলায় লম্বাদাড়ি বালিবুড়ো ঘুরে বেড়ায় – শুনিস্ নি ? ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা রাত্তিরে সমুদ্রের ধারে গেলে বালিবুড়ো এসে খপ্ করে তাদের ধরে ঝোলার ভেতরে পুরে ফেলে। আর লক্ষ্মী ছেলেমেয়েদের বালিবুড়ো রাতের বেলায় এসে সাগরপারের নানাদেশের কত গল্প শুনিয়ে যায়।"

সেদিন রাত্তিরে টম খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ মনে হলো যেন অনেকক্ষণ ধরে লম্বা একটা ঘুম দিয়েছে সে। এই না ভেবে যেই না সে চোখ খুলেছে দেখে সোনালী বালির মতো রঙের জাব্বাজোব্বা পরে এক বুড়ো তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে। মাথায় তার বাবরি করা একরাশ সোনালী চুল হাওয়ায় লুটোপুটি খাচ্ছে। – বুকের ওপর লুটিয়ে পড়েছে এক হাত লম্বা সোনালী দাড়ি।

টম জিজ্ঞেস করলো, "কে তুমি ?"

দাড়ি দুলিয়ে বুড়ো একগাল হেসে বললো, "আমাকে চেনো না বুঝি তুমি ? আমি হলাম বালিবুড়ো। ঐ সাগরপারের বালিয়াড়ীতে আমার বাড়ী।"

টমের একটুও ভয় করলো না। – এই তাহলে বালিবুড়ো ! কেমন হাসি হাসি মুখ, কেমন সোনালী চুল, গায়ের রঙও ঠিক হলুদ বালির মতো। ভারী মজা লাগলো টমের। – মা খালি মিছিমিছি ভয় দেখান।

"এখানে তুমি কি করছো বালিবুড়ো ?" – টম্ জিজ্ঞেস করলো।

"আমি যাচ্ছি আজ রাতে নেংটি ইঁদুরের বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে। যাবে নাকি আমার সঙ্গে ?" – জিজ্ঞেস করলো বালিবুড়ো।

গাল ফুলিয়ে টম বললো, "বারে যাবো কী করে ! বিছানা ছেড়ে

তোমার সঙ্গে এখন বেড়াতে বেরোলে মা ভীষণ রেগে যাবেন। তা জানো না বুঝি?"

"তোমার মা এখন গভীর ঘুমে। কাছেই বিয়েবাড়ী। বেশী দূরে তো নয়—এই তো তোমাদেরই বাড়ীতে। তোমার মায়ের রান্নাঘরের মেঝের নীচে বিয়ের আসর। যাবে তো চলো। ভারী মজা হবে কিন্তু।"

টম অবাক হয়ে বললো, "বারে, মেঝের নীচে আমি ঢুকবো কেমন করে আর তুমিই বা কেমন করে ঢুকবে?"

বালিবুড়ো বললো, "দেখোই না কী হয়।" বিছানা থেকে উঠে টম চললো বালিবুড়োর পেছন পেছন। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে বসবার ঘর, খাবার ঘর, ভাঁড়ার ঘর পেরিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে বালিবুড়ো থামলো। টমকে বললো, "এইখানে দাঁড়াও।" তারপর জোব্বার ভেতর থেকে বের করলো ইয়া লম্বা অদ্ভুত এক পিচকিরী। এমন পিচকিরী টম জন্মে কখনও দেখেনি। টমের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বালিবুড়ো সেই পিচকিরী থেকে একরাশ বালি ছুঁড়ে মারলো টমের গায়ে—'পি-ই-ই-শ্'।

ওমা একি-একি, টম যে ক্ষুদে হয়ে যাচ্ছে। ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে। ছোট হতে হতে—আরো ছোট হতে হতে টম ঠিক কড়ে আঙ্গুলের মতো ছোট্টটি হয়ে গেলো। অবাক হয়ে টম দেখলে বালিবুড়োও ঠিক তার মতো ছোট্ট হয়ে গেছে। তার সোনালী দাড়ি মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে।

আরে, পাশে ওটা কি? —ঐ যে? —আরে এ তো তার খেলাঘর থেকে হারিয়ে যাওয়া সেই সবুজ বোতলের ছিপিটা! এটা এখানে এলো কোথা থেকে? —আর এ কী কাণ্ড, বাঃ, একটা গোঁফওয়ালা বাদামী রঙের ইঁদুর লেজ দিয়ে পেঁচিয়ে ছিপিটা ধরে আছে বেশ শক্ত করে।

বালিবুড়ো বললো, "নাও টম—উঠে পড়ো চট্‌পট্।" ছিপিতে

চড়ে বসলো ওরা দুজন। ভাঁড়ারঘরের মেঝেতে গোল একটা গর্ত ছিলো। সেটা দিয়ে দিব্যি গলে গেলো টম আর বালিবুড়ো ছিপি-গাড়ীতে চড়ে।

ঘটর ঘটর ঘটর ঘটর—ইঁদুরে টানা ছিপিগাড়ী চললো মেঝের নীচে অন্ধকার পথ দিয়ে। উফ্ কী অন্ধকার রে বাবা। —বারবার চোখ কচলেও কিচ্ছুটি দেখতে পেলো না টম।

হঠাৎ টিমটিমে একটু আলো চোখে পড়তেই বালিবুড়োর দিকে ফিরে তাকালো সে। বালিবুড়ো বললো, "এই যে—পৌঁছে গেছি।"

ঐ তো বিয়ের আসর বসেছে। মাঝখানে এক টুকরো কাঠের ওপর ছোট্ট একটা নীল মোমবাতি জ্বলছে।

—আরে এটা তো আমার জন্মদিনের কেকের মোমবাতিটা—টম মনে মনে ভাবলো—এটা এখানে আনলো কে?

বাপ্‌রে বাপ্—কত ইঁদুর সেখানে। ইঁদুরে ইঁদুরে ভরে গেছে বিয়ের আসর—নেংটি ইঁদুর, ধেড়ে ইঁদুর, মোটা ইঁদুর, রোগা ইঁদুর, কালো ইঁদুর, সাদা ইঁদুর, গেছো ইঁদুর, মেঠো ইঁদুর যেদিকে তাকাও —খালি ইঁদুর আর ইঁদুর—কিচ্ কিচ্ কিচ্ কিচ্—পিচ্ পিচ্ পিচ্ পিচ্—কত কথাই না বলছে তারা।

—আর ঐ বুঝি বর কনে? চকচকে গা, নাদুস নুদুস চেহারা, লম্বা গোঁফ। লেজ পাকিয়ে ছোট ছোট দাঁত বের করে ঘুরে ঘুরে দুটিতে কথা বলছে সবার সঙ্গে।

ছোট ছোট পাউরুটির টুকরো, বিস্কুট আর পনীর—এই হলো বিয়ের ভোজ। বেশ হৈ চৈ করে কুট্‌কুট্ কুট্‌কুট্ খেয়ে চলেছে ইঁদুরের দল।

পেট ভরে খেয়ে দেয়ে কখন কীভাবে যে বালিবুড়োর সঙ্গে নেংটি ইঁদুরের বিয়ের আসর থেকে ফিরে এসেছিলো সে কথা টমের মনে নেই।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে টম একবার ভেবেছিলো মাকে সে আগের রাতের কথা সব বলবে। কিন্তু কখনও বলে নি। কেন জানো ? —পাছে বালিবুড়ো রেগে যায়।
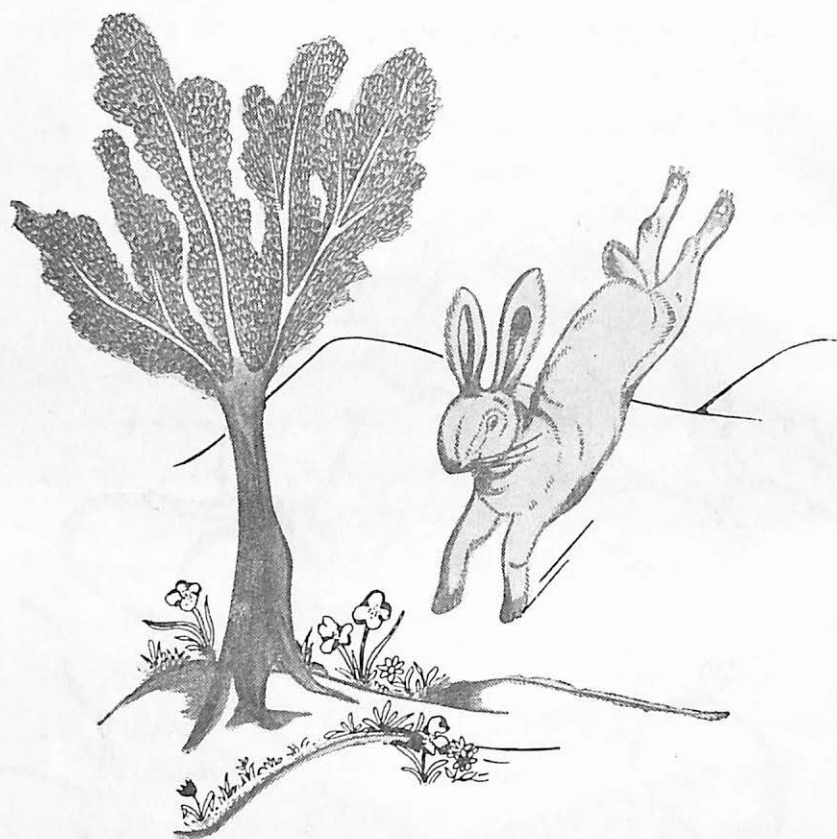
খরগোশ আর সজারু

এক গাঁয়ের এক্কেবারে শেষ মাথায়, যেখানে বনের শুরু সেখানে বৌ আর তিন ছানাপোনা নিয়ে থাকতো এক সজারু। আশপাশের ক্ষেতে তখন শীষে সবে সোনালী রঙ ধরতে শুরু করেছে। পরিষ্কার নীল আকাশ—ঝলমলে সোনা রঙের রোদ্দুরে চারিদিক ঝক্‌ঝক্‌ করছে। সজারু বৌ ছানাপোনাদের নিয়ে কাছেই এক ডোবায় গেছে স্নান করতে।

সজারু ভাবলে, "যাই একবার আমার শালগম ক্ষেত থেকে ঘুরে আসি।"

আসলে কিন্তু ওটা মোটেই সজারুর শালগম ক্ষেত নয়। গাঁয়েরই এক চাষী ঐ ক্ষেতে শালগম বুনেছিলো। কিন্তু সজারু, সজারু বৌ তার ছানাপোনাদের নিয়ে রোজই যেতো ঐ ক্ষেতে শালগম খাবার জন্যে। ওরা ভাবতো শালগমের ক্ষেতটা বুঝি ওদেরই।

সেই সোনালী সকালে সজারু পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়ে দেখ-ছিলো শালগমগুলো বেশ বড়োসড়ো হলো কিনা। হঠাৎ শুনতে পেলো পাশে খচরমচর পাতার আওয়াজ। তাকিয়ে দেখলে পাশের জমিতে যেখানে চমৎকার গোলগাল বাঁধাকপি ফলেছে সেখানে বাদামী রঙের এক খরগোশ বাঁধাকপির কচি পাতাগুলো মনের সুখে চিবিয়ে খাচ্ছে।

সজারু বললে, "এই যে খরগোশ ভাই। খবর সব ভালো তো?" ঐ খরগোশের ছিলো ভারী নাকউঁচু হামবড়া স্বভাব, নিজেকে সে ভাবতো বিরাট একটা কিছু। সজারুর প্রশ্নের কোনো জবাবই দিলো না সে। খাওয়া থামিয়ে কেবল মুখ তুলে তাকালো সে একবার সজারুর দিকে। সামনের বাঁ পাটা দিয়ে গোঁফগুলো মুছে ভারী অসন্তুষ্ট হয়ে বললো, "খাওয়ার সময় অমন বিরক্ত কোরো না তো। দেখছো না কেমন সুন্দর সবুজ কচি রসালো লতাগুলো হয়েছে। তোমাদের জ্বালায় শান্তিতে বসে দুটো খাওয়ারও জো নেই।"

"ও—দুঃখিত ভাই—মাপ করে দিও", বলে সজারু গেলো শাল-গম খেতের অন্যপাশটা দেখতে। সজারু মাটি খুঁড়ে মন দিয়ে শাল-গমগুলো পরীক্ষা করছে দেখে ফ্যাক্ ফ্যাক্ করে হাসতে লাগলো খরগোশ, ঠাট্টার সুরে জিজ্ঞেস করলো, "তা সজারু ভায়া, তুমি আজ সাতসকালে এদিকে—বিশেষ কোনো কাজ আছে নাকি?"

"না—কাজ আর কি?—রোদ ঝলমলে দিন দেখে ভাবলাম—যাই একটু হেঁটে আসি।"

দুষ্টু খরগোশ ঠাট্টা থামালো না, "হিঃ হিঃ, কী যে বলো হিঃ হিঃ হিঃ—শুনলে হাসি পায়—তোমার ঐ ক্ষুদে ক্ষুদে পায়ে হাঁটা ? হাঃ হাঃ হাঃ—হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ···উফ্ হাসিও না আর।"

সজারুর পা দুটো সত্যিই ক্ষুদে,—খানিক বাঁকাও। তাই এমনিতেই সজারুর মনে ভারী দুঃখ। কিন্তু খরগোশ তাই বলে তার পা নিয়ে ঠাট্টা করবে ? আচ্ছা অভদ্র তো। এতটা অপমান সে মোটেও সহ্য করবে না। মজা দেখাবে সে খরগোশকে।

রেগে গেলে সজারুর পিঠের কাঁটাগুলো খাড়া হয়ে ওঠে। সজারু তখন বেজায় রেগে গেছে। পিঠের কাঁটা ফুলিয়ে রাগে গরগর করতে করতে সজারু বললে, "খবরদার—আমার পা নিয়ে অমন তামাশা করবে না। হুঁ—বলে রাখলাম। আমার পা ক্ষুদে হতে পারে তবে তাতে জোর কম নয়। দৌড়ও না দেখি আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। দেখি কেমন পারো ?"

খরগোশ বললে, "বেশ তো চলো। মাঠের এই মাথায় এই স্ট্রবেরী ফলের ঝোপটা থেকে দৌড়নো যাক ঐ মাথায় টিলার ও-পাশে ঐ উইলো গাছটা অবধি।—তৈরী ? —এক, দুই···"

বাধা দিয়ে সজারু বললে, "দাঁড়াও, অত তাড়া কিসের ভাই। আমার এখনও জলখাবারই খাওয়া হয়নি। আধঘণ্টার মধ্যে খেয়ে দেয়ে তৈরী হয়ে আসছি আমি। পালিও না যেন।"

হেলে দুলে বাসায় ফিরে চললো সজারু। যেতে যেতে সে এক বুদ্ধি ঠাওরালো। রাগের মাথায় খরগোশকে বলে ফেলেছে বটে দৌড়ে পাল্লা দেবে কিন্তু সত্যি বলতে কি খরগোশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জেতা তার পক্ষে অসম্ভব।

বাড়ী পৌঁছেই সজারু হাঁকলে, "গিন্নী, ও গিন্নী শিগগীরি এসো।"

সজারু গিন্নী তখন ছানাপোনাদের নিয়ে ডোবা থেকে স্নান সেরে সবে ফিরেছে। সজারুর হাঁকডাক শুনে কোনোমতে ছুটে এলো সে। বললো, "বলি ব্যাপারখানা কি ? এই সকালে এত চেঁচামেচি কেন ?"

সজারু সকালের সব ঘটনা খুলে বললো বৌকে। তারপর বললে, "চট্‌পট্‌ তৈরী হয়ে নাও গিন্নী, এখুনি আমার সঙ্গে মাঠে যেতে হবে। মাঠের ওপাশে শালগম ক্ষেতটা ছাড়িয়ে টিলার ওধারে যে বড় উইলো গাছটা আছে তার নীচে বসে থাকবে চুপটি করে। আর বাদামী খরগোশটাকে দেখলেই বলবে—এই যে আমি পৌঁছে গেছি—হুয়ো—হুয়ো। ব্যস্‌ আর কিচ্ছুটি করতে হবে না তোমাকে। কেমন মনে থাকবে তো?"

তারপর একসময় দৌড় শুরু করলো সজারু আর খরগোশ মাঠের এ মাথায় স্ট্রবেরী ঝোপের ধার থেকে। এক, দুই, তিন"—তীরের বেগে ছুট দিলো খরগোশ। ছোটার বেগে তার কান দুটো একেবারে খাড়া হয়ে উঠলো। মাত্র দু-পা দৌড়ে সজারু কিন্তু ফিরে গেলো আবার স্ট্রবেরী ঝোপের পাশে।

খরগোশ তখন তাকে পেছনে ফেলে চলে গেছে অনেক দূরে। উইলো গাছটা আর মাত্র হাত কয়েক দূরে।

খরগোশ উইলো গাছের নীচে গিয়ে থামতেই সজারু বৌ চেঁচিয়ে উঠলো, "এই যে আমি। পৌঁছে গেছি। হুয়ো হুয়ো।"

সজারু আর সজারু বৌকে দেখতে এক্কেবারে একরকম। কাজেই সজারুর এই চালাকি খরগোশ মোটেই ধরতে পারলো না।

রাগে লেজ ফুলিয়ে, গোঁফ টান টান করে খরগোশ বললে, "আবার দৌড়বো—এবার স্ট্রবেরী ঝোপ অবধি। এক, দুই, তিন…" দৌড়ে খরগোশ এক নিমেষে পৌঁছে গেলো স্ট্রবেরী গাছের ধারে। এবার সজারুর পালা। আহ্লাদে গদগদ সজারু চেঁচিয়ে উঠলো, "এই যে আমি, পৌঁছে গেছি—হেরো হেরো।"

আবার।

আবার।

আবার।

বারবার খালি একবার উইলো গাছ অবধি আর একবার স্ট্রবেরী

ঝোপ অবধি ছুটতে লাগলো বাদামী অহঙ্কারী খরগোশ। আর প্রতিবারই ঘটতে লাগলো একই কাণ্ড, একবার সজারু আর একবার সজারু বৌ বারবার আনন্দে চেঁচাতে লাগলো, "এই যে আমি, পৌঁছে গেছি। ছুয়ো ছুয়ো, হেরো।"

তখন প্রায় বিকেল হয়ে এসেছে। ক্লান্ত খরগোশ এক গাছ-তলায় বসে জিব বের করে হাঁপাচ্ছিলো। তাই দেখে হাসতে হাসতে সজারু বললো, "কেমন ভায়া?—আর আমার পা নিয়ে তামাশা করবে? হলো তো? হেরে গেলে তো?—হেরো…ছুয়ো…ছুয়ো হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ…"

বোকা চাষী বৌ

এক গাঁয়ে থাকতো এক চাষী আর চাষী বৌ। চাষী বৌ ছিলো বেজায় বোকা। তার মতো বোকা বোধহয় আর দুটো ছিলো না। সবসময় চাষী ভয়ে ভয়ে থাকতো কী জানি বৌ তার কখন কী করে বসে।

চাষীর ধন-সম্পত্তি বলতে ছিলো কেবল একথলে সোনার মোহর। চাষীর ঠাকুরদা বুড়ো বয়েসে যখন মারা যান তখন মোহর কটা দিয়ে

গিয়েছিলো তাকে। মোহরগুলো ছিলো তার বড়োই আদরের ধন। ওগুলো সে কখনও কাছছাড়া করতো না।

একদিন চাষী ভাবলো—না এভাবে মোহরগুলো সবসময় সঙ্গে সঙ্গে রাখাও বিপদের। বলা কি যায়! একবার চোর ডাকাতে টের পেলেই হলো! মেরেধরে সব কেড়েকুড়ে নিয়ে যাবে তারা। আর বৌকে তো বলাও যা না বলাও তাই। মাথায় তার ছিঁটেফোঁটাও বুদ্ধি আছে নাকি! কোথায় যে হারিয়ে বসে থাকবে তার ঠিক কি! —হঠাৎ চাষীর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেলো। —হয়েছে—ঠিক হয়েছে। গাছতলায় পুঁতে রাখবে সে মোহরের থলেখানা। কাউকে বলবে না—বৌকেও না।

সেদিনই সন্ধেবেলা। সূর্য ডুবে গিয়ে অন্ধকার চারিদিকে সবে ছড়াতে শুরু করেছে। ক্ষেত থেকে ফিরে পেছনের বাগানে বড়ো এক ওক গাছের তলা খুঁড়তে বসেছে চাষী। বেশ বড়োসড়ো গভীর একটা গর্ত খুঁড়ে মোহরের থলেটা সবে রাখতে যাবে হঠাৎ দেখলে পেছনে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছে চাষী বৌ। হঠাৎ তাকে দেখে চাষীর মুখখানা ভয়ে কাগজের মতো সাদা হয়ে গেলো। তাই দেখে খিলখিল করে হেসে উঠলো চাষী বৌ, "ওমা হলো কি তোমার—আমি কি ভূত নাকি? কি পুঁতছো গো গাছতলায়? —কি আছে ঐ থলের ভেতর?"

ততক্ষণে সামলে নিয়েছে চাষী। তাড়াতাড়ি বললো, "ও কিছু না—কতগুলো সুন্দর দেখতে হলুদ রঙের বোতাম। একেবারে ছোঁবে না বলে দিলাম, মনে থাকে যেন।"

চাষী বৌ বোকা হলেও অবাক না হয়ে পারলো না। জিজ্ঞেস করলো সে, "হলুদ বোতামগুলো শুধু শুধু গাছতলায় মাটির নীচে পুঁতে রাখছো কেন?"

চাষী বললে, "তোমার মাথায় একফোঁটাও বুদ্ধি আছে নাকি যে বললে বুঝবে। যাও যাও কাজের সময় মেলা বিরক্ত কোরো না তো।"

ঘাড় নেড়ে চলে গেলো চাষী বৌ।

এর দিন কয়েক পরে এক তুপুরবেলায় সামনের বাগানে বসে বসে রোদ পোয়াচ্ছিলো চাষী বৌ। চাষী তখন ক্ষেতে কাজ করছে। চাষী বৌ দেখলো তুজন ফেরিওয়ালা মাটির থালাবাসন বিক্রি করতে তাদের গাঁয়ে এসেছে। একটা ঠেলাগাড়ীতে বাসনকোসন চাপিয়ে টুংটাং টুংটাং ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে ফেরিওয়ালা তুজন আসছে ওদেরই বাড়ির দিকে, থেকে থেকে ডাক দিচ্ছে—"বাসন চাই গো বাসন—।"

বাসনগুলো দেখে ভারী লোভ হলো চাষী বৌয়ের। ফেরিওয়ালাদের ডেকে সে বললো, "তোমাদের বাসনগুলো ভারী সুন্দর। কিন্তু আমার হাতে আজ একটাও পয়সা নেই যে তোমাদের কাছে থেকে কিছু কিনি।"

"তবে আর কি! আমরা চলি···।" —টুংটুং করে ঘণ্টা বাজিয়ে ফেরিওয়ালা তুজন ঠেলাগাড়ী নিয়ে রওনা দিলো।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো চাষী বৌ, "ও ফেরিওয়ালা—ফেরিওয়ালা, দাঁড়াও দাঁড়াও, যেও না। আমার কাছে পয়সা নেই বটে তবে চকচকে খানকয়েক হলুদ বোতাম আছে। সেগুলোর বদলে কিছু থালাবাসন বেচবে আমাকে?"

"হলুদ বোতামের বদলে থালাবাসন? হাঃ হাঃ হাঃ"—হেসে গড়িয়ে পড়লো তুই ফেরিওয়ালা—"বলে কি রে—পাগল নাকি? বোতাম দিয়ে কেনাবেচা? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ···"

চাষী বৌ বললো, "আমার যে ছোঁয়া বারণ, তা না হলে এখুনি দেখিয়ে দিতাম কেমন সুন্দর চকচকে জ্বলজ্বলে হলুদ রঙের বোতাম —খারাপ নয় মোটেই।"

ফেরিওয়ালাদের হঠাৎ কেমন খট্‌কা লাগলো চাষী বৌয়ের অদ্ভুত সব কথা শুনে। হাসি থামিয়ে ওরা বললো, "কই কোথায় দেখি তোমার হলুদ বোতাম।"

"উহুঁ — আমার হাত দেওয়া বারণ। পেছনের বাগানের ঐ পূব-কোণে বড়ো এক গাছখানা দেখছো না, ওর নীচে খোঁজো — পাবে।"

মাটি খুঁড়ে থলের মুখ খুলে চোখ কপালে উঠে গেলো দুই ফেরিওয়ালার। —এ যে ঝকঝকে আস্ত সোনার মোহর! প্রথম ফেরিওয়ালা বললো, "চাষী বৌ কি পাগল? বলে কিনা হলুদ বোতাম!" অন্যজন বললো, "নে নে পালা তাড়াতাড়ি।"

এক রাশ মাটির বাসনকোসন চাষী বৌকে দিয়ে তারা মোহরের থলেটা নিয়ে চোখের নিমেষে চম্পট দিলো। সন্ধেবেলা চাষী ঘরে ফিরে দেখে উঠোনে একরাশ মাটির থালাবাটি জড়ো করা রয়েছে। চাষী বৌ একগাল হেসে বললো, "খুব জিতেছি আজ। তুমি তো দিনরাত্তির আমাকে বোকা বলো, কে বোকা তা এখুনি শুনলে বুঝতে পারবে। গাছতলায় পোঁতা তোমার ঐ হলদে বোতামগুলো দিয়ে কত বাসন পেয়েছি দেখো। বোকা বাসনওয়ালাদুটো আজ খুব ঠকেছে। কি বলো? ঘরে গিয়ে এখন তারা কপাল চাপড়াচ্ছে নিশ্চয়ই।"

"হায়-হায়-হায়-হায়" — নিজের কপাল চাপড়াতে শুরু করলো চাষী, কাঁদতে কাঁদতে বললো, "কপাল তারা চাপড়াচ্ছে না বৌ— তারা এখন খুশিতে নাচছে। কপাল চাপড়াচ্ছি আমি। এমন বোকা গাধা মুখ্যু আমি জন্মে দুটো দেখি নি। ওগুলো হলদে বোতাম নয় বুদ্ধু বৌ— ওগুলো সত্যিকার সোনার মোহর।"

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে চাষী বৌ বললো, "তা আমি কি জানি? আমাকে আগে বলো নি কেন?"

হঠাৎ উঠে সোজা হয়ে বসলো চাষী। বললো, "এক্ষুনি চলো— ওই দুই ফেরিওয়ালা জঙ্গল পেরিয়ে আজ রাতে বেশীদূর যেতে পারবে না। যে করেই হোক ধরতে হবে ওদের।

তাড়াতাড়ি পুঁটলিতে কিছু রুটি মাখন পনীর আর বাদাম বেঁধে নিলো চাষী বৌ। তারপর দুজনে চললো জঙ্গলের পথ ধরে ঐ দুই ফেরিওয়ালার খোঁজে।

মাত্র অল্প পথ গেছে তারা, হঠাৎ চাষী বৌ বলে উঠলো, "ঐ যাঃ—বাড়িতে দোর খুলে রেখে এসেছি—।"

চাষী ধমক দিয়ে বললো, "সত্যি বড্ড ভুলো মন তোমার। তুমি যেমনি বোকা তেমনি ভুলোও। কতবার বলেছি না দরজার দিকে সবসময় নজর রাখবে।"

"সত্যি বড্ড ভুল হয়ে গেছে"—চাষী বৌ দৌড় দিলো বাড়ির দিকে। বাড়ি পৌঁছে দরজায় তালা দিতে গিয়ে তার মনে হলো—দরজাটা যদি তালা চাবি দিয়ে বন্ধই করে রেখে যাই তাহলে আর নজর রাখবো কী করে? তাহলে—উপায়?—উপায় ঠিক করে ফেললো চাষী বৌ। কব্জাটব্জা খুলে দরজাটা সে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে চললো সঙ্গে। ব্যস্—আর চিন্তা নেই—এখন সবসময় দরজার দিকে নজর রাখা যাবে।

যেতে যেতে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটা পথ খুব সরু হয়ে গেছে। পথের ধারে এক বিরাট বুনো গাছ। ঠেলাগাড়ি আর ঘোড়ার গাড়ির চাকায় ঘষা খেয়ে খেয়ে তার গুঁড়ির ছাল অর্ধেকটা উঠে গেছে। চাষী বৌ বললো, 'আহা রে—বড়ো ব্যথা না?'—তেল তো নেই, পোঁটলা খুলে মাখনের দলাটা ভাল করে গাছের গায়ে মালিশ করে দিলো সে। বললো, "যা, চাকার ঘষায় আর ব্যথা লাগবে না তোর।"

বৌয়ের কাণ্ড দেখে চাষী তো থ'। হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পেলো না। সব শুনে রাগে কাঁপতে কাঁপতে সে বললো, "সত্যি, বোকা আর কাকে বলে। এখন দরজা টানবো না ঠগ খুঁজবো।"

সারাটা দিন টইটই করে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে তারা আঁতিপাঁতি খুঁজলো ঐ দুই বাসনওয়ালাকে। কিন্তু কোথাও তাদের টিকিটি দেখতে পেলো না।

রাত নামতে একটা উঁচু গাছের ডালে চড়ে বসলো চাষী। কাল সকালে আবার খোঁজা শুরু করতে হবে। চাষী বৌকে বললো,

"আর কি, বোকামির সাজা ভোগ করো এইবার। দরজাটা মাথায় নিয়ে চুপ করে বসে থাকো গাছের ডালে। আগে তোমার পালা। তুমি ক্লান্ত হলে আমাকে দিও।"

চাষী বৌ বললো, "গাছের নীচে দরজাটা রেখে দিই না কেন ?"

"তাহলে তো সবাই জানতে পারবে গাছের ওপর মানুষ বসে আছে ঘাপটি মেরে।"

"হুঁ।"

রাত তখন বেশ গভীর। হঠাৎ তারা শুনলো গাছের নীচে ফিসফিস ফিসফিস মানুষের গলার আওয়াজ—সেই সঙ্গে টুংটাং টুংটাং পয়সা গোনার শব্দ। চাষী বৌ হঠাৎ বললো, "গেলুম"। চাপা গলায় চাষী বললো, "চুপ—কথা বোলো না এখন। এ নিশ্চয়ই ঐ দুই ফেরিওয়ালা।" কিন্তু চাষী বৌ আর থাকতে পারলো না। টাল সামলাতে না পেরে দরজাসুদ্ধ হুড়মুড় করে পড়ে গেলো নীচে।

লোকদুটো আঁতকে উঠে 'ওরে বাবা ভূত, ভূত রে' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে মোহর টোহর পয়সাকড়ি সব ফেলে দিলো চোঁ চাঁ ছুট।

চাষী ঠিকই ধরেছিলো। এ ছিলো ঐ দুই ফেরিওয়ালা। গাছ-তলায় বসে অন্ধকারে চাষীর থলে ভর্তি সোনার মোহর ভাগ কর-ছিলো দুজনে।

ভোরবেলা মোহর নিয়ে ঘরে ফিরতে ফিরতে চাষী এই প্রথম বৌকে বললো, "আমার কথা না শুনে চালাকের মতো কাজ করেছো। ভাগ্যিস দরজাসুদ্ধ ওদের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে। তাই তো মোহরগুলো ফিরে পেলাম। সাবাস বৌ সাবাস।"

রাজা তেলেদাড়ি

এক রাজার ছিলো পরমাসুন্দরী এক মেয়ে। কিন্তু সুন্দরী হলে কি হয়, রাজকন্যার বড্ড নাকউঁচু স্বভাব। রাজা বুড়ো হয়েছেন, রাজকন্যার বিয়ে দেবেন। কিন্তু কাউকেই রাজকন্যের পছন্দ হয় না। যাকেই সে দেখে ঠোঁট উল্টে বলে, "ইস্ এ নাকি আমার বর হবে, এমন বিচ্ছিরি বর আমার চাই না।"

একদিন নানাদেশের বড়ো বড়ো রাজা আর রাজপুত্রদের বিরাট এক ভোজে নেমন্তন্ন করলেন বুড়ো রাজা। ভাবলেন এদের মধ্যে থেকে কাউকে না কাউকে রাজকন্যার নিশ্চয়ই পছন্দ হবে। এত বড়ো বড়ো রাজারাজড়া সব, এমন সুন্দর চেহারার এত রাজপুত্র—এদের মধ্যে অন্তত একজনকে রাজকুমারীর নিশ্চয়ই মনে ধরবে।

কিন্তু ভোজের দিন রাজকন্যা প্রত্যেক রাজপুত্তুরকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা শুরু করে দিলেন। মোটাসোটা প্রথমজনকে দেখে খিলখিল করে হেসে উঠলো রাজকুমারী। নাক কুঁচকে বললো, "এ মা এ তো চালকুমড়ো।"

—"আর এই লম্বা রাজপুত্তুর—ইনি যেন ঢ্যাঙা বাঁশ।"

—"আর ইনি, হিঃ হিঃ হিঃ, এর লাল রঙের চুল দেখো—একে কি বলবো—মোরগঝুঁটি?"

—"আর ইনি যেন ঠিক বাঁকা কাঠি।" —আঙ্গুল দেখালো রাজকন্যা রোগা এক রাজপুত্রের দিকে। ধবধবে ফরসা পরের জনের গায়ের রঙ। রাজকন্যা বললেন, "ইস্—সাদা চাদর।"

খাবার টেবিলে সবার শেষে বসেছিলেন খুব সুন্দর চেহারার দাড়িওয়ালা এক রাজপুত্তুর। তাকে দেখে রাজকন্যার হাসি আর থামে না—হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ···

রাজপুত্রের কালো তেল চুকচুকে দাড়ির দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে রাজকন্যা তো হেসেই খুন,···হিঃ হিঃ ইনি আমাকে বিয়ে করবেন এই তেলেদাড়ি রাজা—মা গো।"

রাজকন্যার আস্পর্দ্ধা দেখে বুড়ো রাজা তো রেগে আগুন। রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন তিনি। লজ্জায় অপমানে তাঁর মুখ উঠলো টকটকে লাল হয়ে। রাজারাজড়া আর রাজপুত্রের দল চলে যাবার পর তিনি ডেকে পাঠালেন রাজকুমারীকে। তাকে ধমক দিয়ে বললেন, "তোমার জাঁক আর বড়াই আমি ভাঙছি। ভিন্‌দেশী রাজা-রাজড়া আর রাজপুত্রদের সঙ্গে যেভাবে তুমি ব্যবহার করেছো তাতে

আমার মানসম্মান আজ ধুলোয় লুটিয়ে গেছে। এর শাস্তি আজই তোমাকে দেবো। রাজবাড়ীতে প্রথম যে ভিখিরি আসবে ভিক্ষে চাইতে তার সঙ্গে আমি বিয়ে দেবো তোমার।"

দিনদুয়েক পরে রাজবাড়ীর ফটকের সামনে "জয় হোক মহারাজ" বলে দাঁড়ালো নোংরা ছেঁড়া জামাকাপড় পরা এক ভিখিরি। হাতে তার পুরোনো একটা বেহালা।

ভয়ে রাজকুমারীর বুক কেঁপে উঠলো। তবু মনে মনে বললো রাজকুমারী, "নাঃ। বাবা কখনই এই ময়লা কাপড় পরা ভিখিরির সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে পারবেন না।"

ভিখিরি তখন বেহালায় চমৎকার এক সুর বাজাচ্ছে আর তালে তালে মাথা দোলাচ্ছেন বুড়ো রাজা।

বাজনা থামলে রাজা বললেন, "সুন্দর—খুব সুন্দর। তোমার বাজনা শুনে খুব খুশী হয়েছি আমি। —তোমাকে আমি উপযুক্ত পুরস্কার দিতে চাই। আমার এই সুন্দরী মেয়েকে তোমার বৌ করে নিয়ে যাও তুমি।"

রাজকন্যা কেঁদে পড়লো রাজার পায়ে। কিন্তু কিছুতেই মন গললো না তাঁর। তিনি রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরা সেই ভিখিরির।

কাঁদতে কাঁদতে রাজকন্যা চললেন ভিখিরির পিছু পিছু। যেতে যেতে যেতে যেতে পথে পড়লো প্রকাণ্ড এক মাঠ আর মাঠের শেষে বিরাট এক দীঘি। রাজকন্যা বললেন, "এ মাঠ কার? —এ দীঘি কার?"

ভিখিরি জবাব দিলো, "যে রাজাকে ঠাট্টা করে তেলেদাড়ি বলেছিলে তুমি—এ মাঠ, এ দীঘির মালিক তিনি।"

"ওঃ"—ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললো রাজকুমারী। "কিন্তু আমি কাকে ঠাট্টা করে কী বলেছিলাম, সে কথা তুমি জানলে কেমন করে?"

ভিখিরি হেসে বললো, "বারে, কে না জানে রাজকুমারীর সেই

ঠাট্টাতামাশার কথা, রাজারাজড়াদের সঙ্গে তার সেই খারাপ ব্যবহারের কথা।”

চুপ করে রইলো রাজকুমারী। মাঠ পার হয়ে তারা এসে পড়লো অন্য এক রাজ্যে। আলো ঝলমল বিরাট এক শহরে। রাজকন্যা জিজ্ঞেস করলো, “কে এই জমকালো রাজ্যের রাজা?”

অল্প হেসে ভিখিরি বললো, “রাজা তেলেদাড়ি।”

মস্ত বড়ো একটা নিঃশ্বাস ফেললো রাজকুমারী। রাগে দুঃখে তাঁর নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে হোল। মনে মনে ভাবলো সে অত জাঁক না দেখিয়ে তখন ঐ তেলেদাড়ি রাজাকে বিয়ে করলেই ভালো হতো। আজ তাহলে এই ভিখিরির পিছু পিছু মাইলের পর মাইল পথ হাঁটতে হতো না। কিন্তু এখন আর সে কথা ভেবে লাভ কি।

অনেকখানি পথ চলে শহরের বাইরে জঙ্গলের ধারে এক পাতার কুঁড়েঘরে এসে ভিখিরি থামলো। অবাক হয়ে রাজকন্যা জিজ্ঞেস করলো, “এ ঘর কার?”

“এ ঘর আমার, আর আজ থেকে এ ঘর তোমারও। এখানেই আমরা সংসার পাতব”, ভিখিরি বললো।

রাজকন্যার দুচোখ ফেটে জল এলো। ভিখিরি বললো, “এই বুঝি কাঁদবার সময়? যাও যাও ঘরদোর ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে, রান্নাবান্নার যোগাড় করো গিয়ে। তারপর সুতো কাটতে হবে কাপড় বুনতে হবে। না হলে আমরা খাবো কি? ভিক্ষে করে তো আমাদের দুজনের পেট চলবে না।”

চোখের জলে ভাসতে ভাসতে রাজকন্যা গেলো ঘরের কাজকর্ম করতে। এতদিন আদরে আহ্লাদে সুখে দিন কাটিয়েছে সে। কোনোদিন কুটোটি নাড়তে হয়নি তাকে। কাজ করতে গিয়ে, সুতো কাটতে গিয়ে, কাপড় বুনতে গিয়ে তার মাখনের মতো নরম তুলতুলে আঙ্গুল কেটে রক্তারক্তি হতে লাগলো। ভিখিরি বললো, “একেবারে অপদার্থ তুমি।” কিন্তু ছাড়া পেলো না রাজকুমারী। এভাবেই কষ্টে দিন

কাটতে লাগলো তার। রাজকুমারী কোনোমতে কাপড় বোনে, বেতের ঝুড়ি বানায়, মাটির হাঁড়ি কলসী তৈরী করে আর ভিখিরি সেগুলো হাটে বেচে তুপয়সা নিয়ে আসে ঘরে।

একদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভিখিরি রাজকন্যাকে বললো, "আমার আজ বড্ড অসুখ। আজ হাঁড়ি কলসী ঝুড়ি বেচতে যেতে হবে তোমাকে।"

রাজকন্যা কেঁদে উঠলো, "আমাকে ? আমি রাজার মেয়ে। হাটের মানুষজন যদি কেউ আমাকে চিনে ফেলে। আমাকে নিয়ে যদি তারা ঠাট্টাতামাশা করে। না—না—সে আমি কিছুতেই পারবো না—কিছুতেই না।"

"কেন পারবে না ?" কঠিন গলায় ভিখিরি বললো, "বড়ো বড়ো রাজারাজড়াদের ঠাট্টাতামাশা করতে তুমি তো ছাড়োনি। —যা বলি শোনো। আজ রাজা তেলেদাড়ির রাজ্যে বিরাট উৎসবের আয়োজন হয়েছে। রাজা যাচ্ছেন বিয়ে করতে। সবাই চলেছে রাজবাড়ীতে আমোদ আহ্লাদে যোগ দিতে। ছেলেমেয়ে, বুড়োবুড়ি, বাচ্চাকাচ্চা সবাই। রাজবাড়ীর মাঠে বসেছে মস্ত এক মেলা। রাজা স্বয়ং আজ মেলা দেখতে আসছেন। আমি চাই—তোমার হাঁড়ি, কলসী, ঝুড়ি আজ তুমি ঐ মেলায় নিয়ে যাও বেচতে।"

"রাজা···তে···লে···দা···ড়ি" বিড়বিড় করে উঠলো রাজকুমারী। তারপর কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো সে, "না—না এ আমি কিছুতেই পারবো না। কিছু—তে—ই—না।"

ধমক দিয়ে উঠল ভিখিরি, "পারতেই হবে। যা বলছি শোনো, যাও।" কী আর করে রাজকন্যা। তাকে যেতেই হলো। শহরে পৌঁছে রাজকন্যা দেখলো সে এক এলাহী ব্যাপার। গান, বাজনা, মেলা বেজায় জমকালো উৎসব। সারা শহরের লোক ভেঙ্গে পড়েছে রাজবাড়ীর মাঠে। রাজবাড়ীর মাথায় নানা রঙের নিশান উড়ছে পত্‌পত্‌ করে। ফটকে দাঁড়িয়ে পাহারাদার—হাতে তার

মস্ত এক সোনার শিঙা। নিজের ভাগ্যের কথা ভেবে দুঃখে রাজকন্যার দুচোখ ভরে জল এলো।

পোঁ—পোঁ পোঁ—পোঁ···শিঙাতে ফুঁ দিলো পাহারাদার। রাজা আসছেন। লোকেরা হুড়মুড়িয়ে ছুটছে রাজবাড়ীর ফটকের দিকে। সোনার তৈরী জমকালো পোষাক পরে ধবধবে সাদা ঘোড়ার পিঠে চড়ে রাজা আসছেন। তাঁর মুকুটের হীরে মণিমুক্তোর ওপর সূর্যের আলো পড়ে রামধনুর নানা রঙ ছিটকে বেরচ্ছে। চুপটি করে পথের ওপর দাঁড়িয়ে রইলো রাজকুমারী। মেলার মাঠে যেতে ভুলে গেলো সে। রাজা কাছে এসে পড়েছেন।

"কিন্তু—এ কি? —এ তার ভিখির বর না! ···কিন্তু—কিন্তু ও রাজপোষাক পরেছে কেন? নাকি ভুল দেখছে সে? ···না-না-ভুল হবে কেমন করে? ঐ তো অবিকল এক মুখ···কিন্তু রাজপোষাক পরে, ঘোড়ায় চড়ে, রাজবাড়ী থেকে···"

হেসে এগিয়ে এলেন রাজা। বললেন, "ঠিকই দেখছো। আমি তোমার ভিখিরি বর। —আর আমিই তোমার সেই রাজা তেলে-দাড়ি। ভাবছো—আমার দাড়িটা কোথায় গেলো?—কেটে ফেলেছি। যেদিন থেকে তুমি আমার নাম দিয়েছিলে 'তেলেদাড়ি'—সেদিন থেকে। তোমাকে আমার ভারী পছন্দ হয়েছিলো। তাই তো ভিখিরি সেজে গিয়েছিলাম তোমায় বিয়ে করতে। তবে তুমি আমাকে আর অন্য রাজারাজড়াদের নিয়ে যে ঠাট্টাতামাশা করেছিলে তার জন্য তোমাকে সাজা দিতেও চেয়েছিলাম, চেয়েছিলাম তোমার অহঙ্কার ভাঙ্গতে। তোমার বাবা সব জানেন। এসো।"

এগিয়ে এসে রাজকুমারীর হাত ধরলেন রাজা তেলেদাড়ি। রাজকুমারী চুপ। হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পেলো না সে।

তারপর আর কি!—সেদিনের উৎসবে প্রাণ ভরে আমোদ আহ্লাদ করেছিলো সারা রাজ্যের লোক। এত ফুর্তি তারা করেছিলো যে জীবনের শেষ দিন অবধি সে কথা তারা ভোলেনি।

হ্যানসেল আর গ্রেটেল

ঘন জঙ্গলের ধারে ছোট্ট এক কুঁড়েঘরে থাকতো খুব গরীব এক কাঠুরে। কাঠুরের ছিলো এক ছেলে—নাম তার হ্যানসেল আর চাঁদের মতো ফুটফুটে এক মেয়ে—গ্রেটেল। ছোট্টবেলায় হ্যানসেল আর গ্রেটেল মাকে হারিয়েছিলো। তাই কাঠুরে আবার বিয়ে করে নিয়ে এলো নতুন এক বৌ। ভাবলো নতুন বৌ, হ্যানসেল আর গ্রেটেলকে ভালো করে দেখাশোনা করবে। কিন্তু তাদের নতুন মা হলো যেমনি হিংসুটে তেমনি বদরাগী। হ্যানসেল আর গ্রেটেল হলো তার দুচোখের বিষ।

কাঠ বেচে কাঠুরের যা দুপয়সা রোজগার হতো তাতে ওরা চারজন ভালো করে পেটপুরে খেতে পেতো না। একরাতে কাঠুরে বৌ কাঠুরেকে বললো, "হ্যানসেল আর গ্রেটেলকে বরং আর কোথাও পাঠিয়ে দাও, না হয়তো ওদের জঙ্গলে রেখে এসো। তাহলে অন্তত আমরা দুজন পেটভরে দুটো খেতে পারবো।"

কাঠুরে বললো, "সে আমি পারবো না, হ্যানসেল আর গ্রেটেল ছেলেমানুষ। কোথায় তাদের পাঠিয়ে দেবো—জঙ্গলেই বা কোথায় ছেড়ে দিয়ে আসবো ওদের। বাঘ ভালুকে যদি খেয়ে নেয়—না না ও আমি পারবো না।"

"কেন পারবে না?"—রেগে উঠলো কাঠুরে বৌ—"খুব পারবে। চালাক ছেলেমেয়ে ওরা। বাঘভালুকে খাবে না ওদের। কোথাও না কোথাও থাকবার জায়গা ওদের ঠিক জুটে যাবে।"

কাঠুরে যতই না না করতে লাগলো কাঠুরে বৌ ততই রেগে উঠতে লাগলো। কাঠুরে বৌ বললো, "তোমার কোনো কথা শুনছি না আমি। কাল সকালে হ্যানসেল আর গ্রেটেল আমাদের সঙ্গে বনে যাবে কাঠ কুড়োতে। তারপর যখন সন্ধ্যে নামবে তখন ওদের ফেলে রেখে ফিরে আসি যদি..."

ভাইবোনে পাশের ঘরে বিছানায় শুয়ে শুনলো সব কথা। ভয়ে গ্রেটেল ভাইকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো, "কী হবে রে ভাই হ্যানসেল ? কী হবে ?"

হ্যানসেল বললো, "কিছু ভাবিস না বোন। একটা উপায় ঠিক খুঁজে বার করবো।"

খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে হ্যানসেল চুপ করে ভাবতে লাগলো—কী করা যায়! আকাশে থালার মতো মস্ত গোল চাঁদ উঠেছে। বাইরে পথের নুড়িগুলো চাঁদের আলোয় চিকমিক চিকমিক করছে। হঠাৎ হ্যানসেলের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেলো, "বাঃ, ঠিক হয়েছে"—ফিসফিস করে উঠলো হ্যানসেল। গ্রেটেলের কানের কাছে মুখ এনে চুপিচুপি বললো, "ঘুমিয়ে পড়্ বোন—কিছুটি ভাবিস না। উপায় আমি বের করেছি।"

দরজা খুলে পা টিপে টিপে বেরিয়ে পকেট ভরে নুড়ি কুড়লো হ্যানসেল। পরদিন সকালে একটার পর একটা নুড়ি পথে ফেলতে ফেলতে বাবা মার পিছু পিছু বনে চললো হ্যানসেল আর গ্রেটেল। কাঠুরে আর কাঠুরে বৌ কিছুই জানতে পারলো না। জঙ্গলে মস্ত এক ঝাঁকড়া গাছের নীচে ভাইবোনকে বসিয়ে রেখে কাঠ কাটতে গেল কাঠুরে আর তার বৌ। অনেকক্ষণ ধরে কাঠ কাটার ঠক ঠক শব্দ শুনতে পেলো ওরা। তারপর দুভাইবোনে কখন যে খেলায় মেতে গেছে তা ওরা নিজেরাই জানে না। খেয়াল হলো যখন দেখলো সন্ধ্যে নেমে গেছে। কাঠ কাটার শব্দ থেমে গেছে কখন। ভয়ে ফুপিয়ে কেঁদে উঠলো গ্রেটেল,—"সত্যি সত্যি তাহলে বাবা মা আমাদের জঙ্গলে রেখে গেছে ? কি হবে রে হ্যানসেল ?"

"কাঁদিস না বোন", গ্রেটেলের হাত ধরে হ্যানসেল বললো, "দেখ না এখুনি মস্ত বড়ো চাঁদ উঠবে। তারপর পথের ওপর ফেলে আসা নুড়িগুলো দেখে দেখে রাস্তা চিনে ঠিক বাড়ি ফিরে যাবো।"

একটু বেশি রাত হতে আকাশে গোল থালার মতো মস্ত চাঁদ

উঠলো। হ্যানসেল বোনের হাত ধরে টান দিলো, "দেখ্ দেখ্ চাঁদের আলোয় নুড়িগুলো কেমন চিকচিক করছে দেখ। পথ চিনে এখুনি ঘরে ফিরে যাবো আমরা।"

ছেলেমেয়েদের ফিরতে দেখে কাঠুরে মহাখুশি। আহ্লাদে দুভাইবোনকে বুকে জড়িয়ে ধরলো সে। কিন্তু কাঠুরে বৌ উঠলো ভীষণ রেগে। সে-রাতে হ্যানসেল আর গ্রেটেলের দরজায় ভালো করে খিল আটকে রাখলো সে। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই কাঠুরে বৌ ওদের নিয়ে চললো আরো গভীর বনে। কাঠুরের তখনও ঘুম ভাঙে নি। দুভাইবোনের পকেটে দুটুকরো শুকনো রুটি গুঁজে দিয়ে কাঠুরে বৌ বললো, "ঘরে কোনো খাবার নেই। চল্ পাশের গাঁ থেকে কিছু খাবারদাবার কিনে আনি গে।"

চলতে চলতে গাঁয়ের রাস্তা ছেড়ে ওরা ঢুকলো জঙ্গলে। হ্যানসেলের মনে কেমন খটকা লাগলো। সে সৎমাকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো, "এ পথে আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

"অত খোঁজে তোর দরকার কি? পা চালিয়ে চল্", তাড়া লাগালো কাঠুরে বৌ।

হ্যানসেলের পকেটে আজ আর নুড়ি নেই, আছে কেবল এক-টুকরো শুকনো রুটি। কাঠুরে বৌ-এর চোখের আড়ালে তাই-ই একটু একটু করে ছিঁড়ে পথে ফেলতে লাগলো সে। জঙ্গল ক্রমেই আরো গভীর হয়ে উঠেছে।

এক জায়গায় বড়ো বড়ো বুনো গাছে ঠাসাঠাসি। দিনের বেলাতেও কেমন যেন অন্ধকার। সেখানে এক গাছতলা দেখিয়ে কাঠুরে বৌ বললো, "বোস এখানে, কাছেই একটা ডোবা আছে। সেখান থেকে জল নিয়ে আসি। তারপর খাওয়াটা শেষ করে আবার হাঁটা দেবো।"

কাঠুরে বৌ গেলো জল আনতে। কিন্তু গেলো তো গেলোই। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নামলো। কাঠুরে বৌ ফিরলো না। গ্রেটেল বললো, "কী হবে?"

কী হবে তা হ্যানসেলও জানে না। এখন উপায় কি ?—আরে দূর, এত কেন ভাবছে সে ? হঠাৎ কী একটা মনে পড়তেই হ্যানসেল খুশি হয়ে উঠলো, বললো, "ইস্, ভুলেই গিয়েছিলাম। আসবার সময় পথে আমি রুটির টুকরো ফেলতে ফেলতে এসেছি না। চল্— বিকেলের আলো থাকতে থাকতে রুটির টুকরোগুলো দেখে ঘরে ফিরে যাই আমরা। আয় শিগ্‌গিরি আয়।" কিন্তু কোথায় ?—পথে তো একটাও রুটির টুকরো নেই। তন্নতন্ন করে খুঁজলো দুই ভাইবোন। থাকবে কেমন করে ? বনের পাখিরা সব খেয়ে নিয়েছে যে।

রুটির টুকরো খুঁজতে খুঁজতে জঙ্গলের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেলো ওরা। দেখতে দেখতে রাত নেমে এলো। ঘুটঘুটে অন্ধকারে একটা গাছের তলায় বসে কোনোমতে রাত কাটালো হ্যানসেল আর গ্রেটেল।

পরদিন ভোর হতে আবার চলতে শুরু করলো দুভাইবোন। কোন্‌দিকে গেলে এই ভয়ানক জঙ্গল থেকে বেরনো যায় ভাবতে ভাবতে মাত্র কয়েক পা গেছে হঠাৎ দেখে সামনে একটা খোলা জায়গায় ভারী মজার এক বাড়ি। কাছে গিয়েই চেঁচিয়ে উঠলো গ্রেটেল, "এই হ্যানসেল দেখ্ দেখ্—বাড়ির দেওয়ালগুলো দেখ্ —সত্যিকার পিঠে দিয়ে তৈরী। আর জানলা দরজাগুলো দেখেছিস্ —রঙীন চিনি দিয়ে বানানো। আর—ওমা কী মজা ! ওদিকে দেখ্ —বাড়ির ছাদ থেকে কতকরম মণ্ডামিঠাই ঝুলছে দেখ্। হি-হি-হি।"

গপাগপ কপাকপ ভাইবোনে মিলে দরজা জানলা ভেঙে খেতে শুরু করে দিলো। বেজায় খিদে পেয়েছিলো দুজনের। সবুজ চিনি দিয়ে তৈরী জানলার কার্নিশের একটা পাশ ভেঙে কামড় বসিয়ে- ছিলো হ্যানসেল, হঠাৎ শুনলো খ্যাক্ খ্যাক্ করে বিচ্ছিরি বিদঘুটে এক হাসি। চম্‌কে চেয়ে দেখলো দরজা খুলে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে বিচ্ছিরি দেখতে এক বুড়ি। মাথায় তার জটপাকানো শণের দড়ির মতো চুল। তোবড়ানো ভাঙা গাল। গোল গোল চোখদুটো যেন ঠিকরে বেরচ্ছে। ফোকলা দাঁতে খ্যাক্‌খ্যাক্ করে হাসছে

বুড়ি। হ্যানসেল আর গ্রেটেল ছুটে পালাতে যাচ্ছিলো। বুড়ি বললো, "এই যাস্ কোথায় ? খিদে পেয়েছে তো ঘরে আয় না। ভালো ভালো খাবার আছে অনেক। খেতে দেবো। আয়।"

পায়ে পায়ে ঘরে ঢুকে ওরা দেখলো—সত্যি—টেবিলের ওপর সাজানো আছে ভূরি ভূরি খাবার—নানারকমের ফলমূল—মণ্ডা-মিঠাই। এত খাবার কখনও চোখে দেখেনি হ্যানসেল আর গ্রেটেল। হাপুসহুপুস খেলো দুই ভাইবোন। শাদা ধবধবে নরম পালকের বিছানা পেতে দিয়ে বুড়ি বললো, "এত রাতে যাবি কোথায় ? এখানেই শুয়ে থাক্ আজ। কাল সকালে উঠে বাড়ি যাস।" বিছানায় শোয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়লো হ্যানসেল আর গ্রেটেল।

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে হ্যানসেল তো অবাক।—এ কোথায় সে ? কাল রাতে তো বিছানায় ঘুমিয়েছিলো ওরা দুজন—আর আজ এখানে এই খাঁচার মধ্যে তাকে বন্দী করলো কে ? গ্রেটেলই বা কোথায় ?—হ্যানসেল বুঝতে পারলো এ বুড়ি ডাইনীবুড়ি—ডাইনী-বুড়ির খপ্পরে পড়েছে ওরা।

খাঁচার সামনে এসে ডাইনীবুড়ি বললো, "কি রে ঘুম ভাঙলো ? থাক্ ওখানে। খেয়েদেয়ে আর-একটু মোটাসোটা হ', তারপর তোকে সেদ্ধ করে খাবো। খিক্-খিক্-খিক্···।"

হ্যানসেলের এবার চোখ পড়লো গ্রেটেলের দিকে। ঐ তো ঘরের কোণে বসে বসে কাঁদছে সে। বেচারা গ্রেটেল। ডাইনীবুড়ি হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠলো, "এই মেয়ে, কী যেন নামটা তোর—হ্যাঁ গ্রেটেল—এই, ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে কান্না কিসের রে—যা যা জল তোল—বাসন মাজ—ওঠ্।"

হ্যানসেল আর গ্রেটেল বন্দী হয়ে রইলো ডাইনীর বাড়িতে। সারাক্ষণ ডাইনীবুড়ির ফাইফরমাশ খাটতে লাগলো ছোট্ট গ্রেটেল। আর হ্যানসেল রইলো খাঁচার ভেতরে বন্দী হয়ে। ডাইনীবুড়ি চোখে ভালো দেখতে পেতো না, মাঝে মাঝে হ্যানসেলের খাঁচার সামনে গিয়ে

সে বলতো, "কই বাবা ঠ্যাঙখানা বার কর্ তো—দেখি কতটা মোটা হলি।" চালাক হ্যানসেল করত কি প্রতিবারই একটুকরো মাংসের হাড় খাঁচার গরাদ দিয়ে বার করে দিতো। টিপেটুপে ডাইনী বলতো —নাঃ হয়নি—আর-একটু মোটা হয়ে নে—তারপর ইয়াম ইয়াম…" সুড়ুৎ করে জিভ টানতো ডাইনীবুড়ি। লোভে তার মুখে জল এসে যেতো। এভাবে দেখতে দেখতে পুরো একটা মাস কেটে গেলো। একদিন ডাইনীবুড়ি বললো—"বুঝেছি আর মোটা হবি না তুই। কিন্তু আর তো অপেক্ষা করা যায় না। আজ তোকে খাবো আগে কড়মড়িয়ে, তারপর ঐ মেয়েটাকে।—এই মেয়ে, গেলি কোথায়? উনুনের ওপর হাঁড়িতে জল বসিয়েছি—দেখ্ দেখি জলটা ফুটলো কিনা—ছেলেটাকে ভালো করে সেদ্ধ করতে হবে তো।"

মস্ত এক উনুনে গনগনে আগুন জ্বলছে। তার ওপর প্রকাণ্ড এক তামার হাঁড়িতে জল চড়িয়েছে ডাইনীবুড়ি।

গ্রেটেল বললো, "দেখবো কেমন করে—বড্ড উঁচুতে যে হাঁড়িটা।" ডাইনীবুড়ির তখন জিভে জল ঝরছে। একটা পিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে হাঁড়ির ওপর ঝুঁকে পড়ে ডাইনী বললো, 'এই—এমন করে গাধা—এমন করে…।"

যেই না বলা পেছন থেকে গ্রেটেল গায়ের জোরে ডাইনীবুড়িকে দিলো এক ঠেলা। টাল সামলাতে না পেরে হুড়মুড় করে ডাইনী-বুড়ি পড়লো গিয়ে হাঁড়ির টগবগে গরম জলে আর সেখানেই পুড়ে মরলো সে।

ডাইনীবুড়ির বাড়ি থেকে অনেক সোনাদানা, মোহর আর ধনরত্ন নিয়ে বাড়ি ফিরে এলো হ্যানসেল আর গ্রেটেল। ভাবছো তো কী করে পথ চিনে ফিরলো ওরা। আসলে জঙ্গলের পথে হাঁটতে হাঁটতে ওরা এক কাঠুরের দেখা পেয়ে গিয়েছিলো হঠাৎ…। অত ধনরত্ন নিয়ে বাড়ি ফিরেছে দুভাইবোন তাই কাঠুরে বৌ ওদের কিচ্ছুটি বললো না। বেশ সুখেই দিন কাটতে লাগলো ওদের।

সাতকুঁড়ে

এক গাঁয়ে এক গাছতলায় বসে আরামে রোদ পোয়াচ্ছিলো সাতজন লোক। তারা কেউ কাউকে চিনতো না। কে যে কোথা থেকে এসেছে তাও কেউ জানতো না। কিন্তু তারা যে সবাই বেজায় কুঁড়ে তা তারা নিজেরাই অল্পক্ষণের মধ্যে টের পেয়ে গেলো।

প্রথম লোকটি অতিকষ্টে খানিক নড়ে চড়ে বললো, "সকালের এই মিষ্টি রোদ্দুরে শুয়ে শুয়ে কুঁড়েমি করতে ভারী আরাম। সবাই যে চলে ফিরে উঠে হেঁটে কী আরাম পায় আমি ভেবেই পাই না। উঠে যেতেও আমার কুঁড়েমি লাগে। আমি একসাথে অনেকটা খেয়ে নি—যতটা পারি আর কি—তারপর উপোষ করি যতদিন না আবার খিদে পায়। ঘুম ভাঙতেও আমার বেশ বেলা হয়ে যায়। তবু দুপুর হতে না হতেই আমি গাছের ছায়ায় আবার শুয়ে পড়ি। তা না হলে শরীর আমার চলেই না।"

প্রথমজনের কুঁড়েমির ফিরিস্তি শুনে পাশ ফিরে শুলো দ্বিতীয় লোকটি। আড়মোড়া ভেঙে বললে, "আমার কপালে ভাই তোমার মতো সুখ নেই। আমাকে আস্তাবলে কাজ করতে হয় কিনা। মনিবের ঘোড়াটাকে দেখতে হয়। তবে তার মাঝেই যেটুকু পারি কুঁড়েমি করে নিই।"

"কেমন ? কেমন ?" —একসঙ্গে জানতে চাইলো বাকী ছজন।

"আমি ঘোড়ার মুখ থেকে কক্ষনও খাবারের ছিবড়েগুলোকে বের করি না। ঘোড়ার মুখটা সবসময় খানিক ভর্তি থাকলে অত দানাপানি দিতে হয় না। আর তেমন কুঁড়েমি লাগলে ঘোড়াকে খেতেই দিই না। সন্ধ্যেবেলা আবার ঘোড়ার গাটা একটু দলে মেজে দিতে হয়। তা শুয়ে শুয়েই দুপা দিয়ে কাজটা কোনোমতে সেরে ফেলি। এর বেশি খাটনি আমাকে পোষায় না ভাই।"

পরের জন সায় দিয়ে বললো, "ঠিকই তো—অত কেন খাটতে

যাবো ? বেশি খেটে লাভ কি ? এই তো সেদিন আমি রোদ্দুরে শুয়ে আরামে ঘুম দিচ্ছিলাম। এমন সময় বৃষ্টি এলো। উঠবো কেন ? আমি বললাম ঝম্‌ঝম্ ঝম্‌ঝম্ যত পড়বি পড়্, আমি এখন উঠছি না। সে কী দমকা হাওয়া আর বৃষ্টির তোড়। সেই তোড়ে আমার চুলগুলো মাথা থেকে খুলে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো। একটা ছোটো পাথর ছুটে এসে আমার মাথার খুলিতে ফুটো করে দিলো। উঠতে কুঁড়েমি লাগে না ? উঠলাম না। পরে একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে নিলাম মাথায়। এমন যে কতবার হয়েছে আলসেমি করতে গিয়ে কী বলবো।"

চার নম্বর লোকটি বললো, "আমি তো কোনো একটা কাজ করতে হবে শুনলে তার আগে তিন সপ্তাহ একটানা ঘুমিয়ে নিই। জামাকাপড় আমি কক্ষনও খুলি না। অত কে খাটতে যাবে বাপু ? কাপড় নোংরা হলে জামাকাপড় সুদ্ধু আমি পুকুরে ডুব দিয়ে নি। আর জুতোর ফিতে বাঁধা, ভাবো, সেটাও কী কম খাটনির কাজ ? ফিতে না বাঁধলে বড়ো জোর জুতোটা খুলে পড়ে যাবে। তা যাক্ না —তাই বলে অত কে খাটবে ভাই ?"

পরের লোকটি ব্যাজার মুখে বললো, "আমার ভাগ্য ভাই তোমাদের মতো অত ভালো নয়। আমার মনিবও বড্ড কড়া। সবসময়ে আমার ওপর তাঁর কড়া নজর। তবে হ্যাঁ একটা সুবিধে কী জানো ? মনিব আমার প্রায় সময়ই বাইরে কাটান। ব্যস্—অমনি ভাবছো আমি দিব্যি কাজে গাফিলতি করে দিন কাটাই। হুঁ সেটি আমি হতে দিই না। মনিব হাঁক দিলেই আমি মিন্‌মিন্ করে সাড়া দিই— যা-ই-হু-জু-র। সাড়া না দিলেই তো গোলমাল। তারপর যত আস্তেই হাঁটি না কেন টুকুস টুকুস করে ঠিক গিয়ে হাজির হই মনিবের কাজে। তবে কী জানো ভাই ? একবার শুয়ে পড়লে উঠতে আমার বড্ড আলসে লাগে। সত্যি বলতে কী একবার ঘুমিয়ে পড়লে আমাকে ডেকে তোলে কার সাধ্যি। একবার হলো কী আমি ঘুমিয়ে

পড়েছি—মনিব ডেকে ডেকে আমার সাড়া পায় নি। শেষে বাড়ির আর-পাঁচজন লোক মিলে আমাকে চ্যাংদোলা করে তুলে মনিবের কাছে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, তবে আমি চোখ খুলেছি।"

ছ-নম্বর বললো, "তা যা বলেছো, ঘুমলে বা শুলে আমারও নড়তে চড়তে বড্ড কুঁড়েমি লাগে। এই তো দেখো না একবার আমি পথের ওপর গাছের ছায়ায় হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে দিব্যি ঘুম দিচ্ছি। এক লোক ঘড়র ঘড়র ঘড়র ঘড়র করে একটা ঠেলাগাড়ি আমার বাঁ পা-খানার ওপর দিয়ে চালিয়ে দিলো। পা-টা হয়তো আমি সরিয়ে নিতাম কিন্তু গাড়ির আওয়াজ আমার কানেই যায় নি। কেন জানো ? এক ঝাঁক বোলতা তখন আমার কানের কাছে ভোঁ-ভোঁ করছিলো। ভাব-ছিলাম করুক ভোঁ-ভোঁ, কে আবার কষ্ট করে ওগুলোকে তাড়ায়।"

সবশেষ লোকটি তখন বললো, "হ্যাঁ—গাড়ির কথায় মনে পড়ে গেলো। এই তো সেদিন। ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে আমি মনিবের খামারবাড়িতে যাচ্ছি। ইচ্ছে হলো একটু গড়িয়ে নিই। খড় পেতে গাড়ির মধ্যে শুয়ে পড়লাম। কখন ঢুলুনি এসে গেছে—হাত থেকে লাগাম আলগা হয়ে গেছে টের পাইনি। যখন খেয়াল হলো দেখি গাড়ি নালায় গিয়ে পড়েছে। তা পড়েছে পড়ুক। উঠতে কুঁড়েমি লাগলো। দেখলাম গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা এসে গাড়ি থেকে এটা-ওটা নিয়ে পালাচ্ছে—নড়তে ইচ্ছে হলো না। শেষমেশ খবর পেয়ে মনিব এসে গাড়ি, ঘোড়া আর আমাকে উদ্ধার করে বাড়ি নিয়ে গেলেন। মনিব যদি সেদিন আমায় বাড়ি নিয়ে না যেতেন তবে এখনও সেখানে দিব্যি ঘুমিয়ে থাকতে পারতাম—এখানে শুয়ে শুয়ে কষ্ট করে তোমাদের সঙ্গে বকর বকর করতে হতো না।"

রামপুটিতিন

এক তাঁতীর ছিলো খুব সুন্দরী এক মেয়ে। মেয়েটি ছিলো যেমনি সুন্দরী তেমনি চালাকচতুর। কিন্তু হলে কি হয়—তাঁতীর ছিলো মস্ত একটা দোষ। তাঁতী মেয়ের নামে বাড়িয়ে নানা কথা বলে বেড়াতো। সকলকে সে বলতো মেয়ে আমার কেবল সুন্দরী আর চালাকই নয়, চরকায় খড় কেটে সে সোনার সুতো বানাতে পারে।

দেখতে দেখতে কথাটা গেলো রাজার কানে। রাজা ডেকে পাঠালেন তাঁতীকে। বললেন, "এ কথা কি সত্যি ?"

তাঁতী ভাবলো রাজা কি আর পরীক্ষা করতে যাচ্ছেন? ঘাড় নেড়ে সে বললো, "হ্যাঁ মহারাজ—একেবারে সত্যি?"

রাজা বললেন, "বেশ, বেশ,—খুব ভালো কথা। নিয়ে এসো তোমার মেয়েকে আমার রাজসভায়। পরখ করে দেখতে চাই সত্যি সত্যি সে চরকায় খড় কেটে সোনার সুতো বানাতে পারে কিনা।"

ভয়ে তাঁতীর বুক উঠলো কেঁপে। কিন্তু উপায় নেই। রাজার হুকুম। অমান্য করে তার সাধ্যি কি।

মেয়েকে নিয়ে সে এলো রাজসভায়।

রাজা চললেন তাঁতীর মেয়েকে নিয়ে তাঁর প্রাসাদের ভেতরে। দালানের পর দালান, খিলানের পর খিলান পার হয়ে তারা পৌঁছলো ভেতর বাড়ীর মস্ত এক ঘরে। সেই ঘরে বোঝাই করা রয়েছে রাশি রাশি খড়। রাজা বললেন, "তুমি শুনেছি খড় কেটে সোনার সুতো বানাতে পারো। এই ঘরের সমস্ত খড় কেটে কাল সকালের মধ্যে সোনার সুতো বানানো চাই। যদি পারো তুমি আমার রানী হবে। আর না যদি পারো তো তোমার মাথা কাটা যাবে।" এই বলে ঘরের দরজায় বাইরে থেকে শেকল তুলে দিয়ে চলে গেলেন রাজা।

মাথায় হাত দিয়ে বসলো তাঁতীর মেয়ে। বসে বসে সে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো। ভাবতে লাগলো চরকায় খড় কেটে কী করে সোনার সুতো বানাবে সে! এ যে অসম্ভব কথা, বাবার যদি কিছুমাত্র আক্কেল থাকে।—ভেবে ভেবে কূলকিনারা না পেয়ে খড়ের গাদার ওপর বসে বসে কাঁদতে লাগলো তাঁতীর সুন্দরী মেয়ে।

ঠিক মাঝরাতে রাজবাড়ির বড় ঘড়িটায় ঢং ঢং করে যেই বারোটা বাজলো অমনি ঘরের দরজাটা খুলে গেলো আস্তে আস্তে, দরজা খোলার শব্দে চমকে ফিরে তাকালো তাঁতীর মেয়ে। দেখলো তিন হাত লম্বা বিদ্‌ঘুটে চেহারার এক বামন দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকছে। ফড়িং-এর মতো লাফাতে লাফাতে এগিয়ে এলো বামনটা। বাঁশীর

মতো মিহি গলায় বললো, "কি গো মেয়ে কাঁদছো কেন ? ব্যাপার-খানা কি ?"

তাঁতীর মেয়ে বললো, "সে কথা শুনে লাভ কি তোমার ? পারবে তুমি আমাকে সাহায্য করতে ?"

একগাল হেসে বামন বললো, "হয়ত পারবো। বলেই দেখো না।" তার বিপদের কথা সব খুলে বললো তাঁতীর মেয়ে। শুনেই, তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলো বামনটা। তারপর হো হো করে হেসে বললো, "ওঃ এই কথা ? এর জন্যে এত কান্না তোমার ? এ ঘরের সব খড় কেটে আমি সোনার সুতো বানিয়ে দিতে পারি এখুনি। কিন্তু তার আগে মেয়ে, বলো তো দেখি, কী দেবে তুমি আমাকে ?"

গলায় পরা সোনার হারটা দেখিয়ে তাঁতীর মেয়ে বললো, "এইটা।"

ফিচ ফিচ করে হেসে বসে গেলো বামন চরকাটা নিয়ে। চরকার চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মিহি সুরে গাইতে লাগলো সে—

"ঘুরপাক ঘুরপাক
চরকার চাকা
কাটো খড় সোনা সুতো
রাজা ভ্যাবাচাকা।"

ভোর হবার আগেই খড় কেটে সোনার সুতোয় ঘর ভরিয়ে তুললো বামন। সকালে এসে ব্যাপার দেখে রাজা তো সত্যিই ভ্যাবাচাকা, সেই সঙ্গে আহ্লাদে আটখানাও বটে। খুশী হয়ে তিনি তাঁতীর মেয়েকে নিয়ে গেলেন খড় বোঝাই আরো বড়ো একটা ঘরে। বললেন, "কাল সকালের মধ্যে, এইসব খড় থেকে সোনার সুতো বার করা চাই। না পারলে তোমার গর্দান যাবে আর পারলে তুমি হবে আমার রানী।"

বসে বসে গালে হাত দিয়ে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবছিলো আর কাঁদছিলো তাঁতীর মেয়ে। সেদিনও ঠিক মাঝরাতে এসে হাজির হলো

সেই বিদ্‌ঘুটে চেহারার তিন হাত লম্বা বামনটা। তাঁতীর মেয়ের চোখে জল দেখে সে বললো, "এবারে আমাকে কী দেবে মেয়ে ?"

মুখে হাসি ফুটলো তাঁতীর মেয়ের। আঙুল থেকে সোনার আংটিটা খুলে এগিয়ে দিলো সে বামনের দিকে। বললো, "এতে হবে ?"

একগাল হেসে ঘাড় হেলিয়ে বামন জবাব দিলো, "হ্যাঁ—খুব হবে।" তারপর তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে বোঁ বোঁ করে তিন পাক ঘুরেই চরকা নিয়ে বসে গেলো সে আর ভোরের আলো ফোটবার আগেই সব খড় কেটে রাশি রাশি সোনার সুতো বানিয়ে ফেললো।

রাজামশাইয়ের লোভ কিন্তু মিটলো না। পরদিন তিনি তাঁতীর মেয়েকে নিয়ে গেলেন খড় ভর্তি আরো মস্ত একটা ঘরে। বললেন, "আজই তোমার পরীক্ষার শেষ দিন। কাল সকালের মধ্যে এ ঘরের সব খড় কেটে যদি পারো তুমি সোনা বানাতে তাহলেই কাল থেকে তুমি হবে রাজরানী। আর না পারো যদি তো কাটা যাবে তোমার মাথাটি।"

গাদা করা খড়ের পাশে বসে গালে হাত দিয়ে ভাবছিলো তাঁতীর মেয়ে—আর কি আসবে সেই বামন ? পর পর দু রাত আমাকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছে সে। আজও কি আসবে সে আমাকে বাঁচাতে ? —ভাবতে ভাবতে কখন যে রাত বারোটা বেজে গেছে খেয়ালই করেনি তাঁতীর মেয়ে। হঠাৎ দরজায় 'খুট' করে আওয়াজ হতে চমক ভাঙলো তার—লাফাতে লাফাতে ঘরে ঢুকছে সেই বিচ্ছিরি বিদ্‌ঘুটে বামন। ঢুকেই বামনটা বললো, "এবারে তুমি আমাকে কী দেবে বলো দেখি ?"

আমতা আমতা করতে লাগলো তাঁতীর মেয়ে।—"আ-আর তো আমার কিচ্ছুটি নেই ভাই যে তোমাকে দিই।"

খিক খিক করে হেসে উঠলো বামন, "হিঃ-হিঃ—ওমা নেই বললে হবে কী করে গো ? আজ নেই বটে, কিন্তু কাল তো সব হবে,

আমি আজ সোনার সুতো বানিয়ে দিলে কাল তুমি রাজরানী হবে।
তাই নয় কি ?"

মাথা নীচু করলো তাঁতীর মেয়ে, "কী জানি। রাজারাজড়ার কখন যে কি খেয়াল হয় ?"

"অতশত জানি না আমি", মাথা নেড়ে বামন বললো, "কাল যদি তুমি রানী হও, তাহলে প্রতিজ্ঞা করো, তোমার প্রথম যে ছেলেটি বা মেয়েটি হবে, তাকে তুলে দেবে আমার হাতে।"

তাঁতীর মেয়ে চুপ করে আছে দেখে বামন বললো, "এই শর্তে রাজী না হলে তোমার জন্য সোনার সুতো আমি কক্ষনও কেটে দেবো না। রাজী না হও তো এই আমি চললাম।"

বামন চলে যায় দেখে তাঁতীর মেয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, "বেশ কথা দিলাম আমি। রানী হবার পর আমার প্রথম যে ছেলে বা মেয়ে জন্মাবে তাকে দেবো তোমায়। চলে যেয়ো না তুমি।"

চরকা নিয়ে বসে গেলো বামন। সুর করে গাইতে লাগলো,

"ঘরঘর ঘরঘর –
ঘোরে চাকা চরকার
তাঁতী মেয়ে রানী হবে
সোনা সুতো দরকার।"

ঘরঘর ঘরঘর চরকার চাকা চালিয়ে ঘর বোঝাই খড় কেটে রাশি রাশি জ্বলজ্বলে সোনার সুতো বানিয়ে দিলো ঐ কিম্ভূতকিমাকার তিন হাত লম্বা বামন।

রাজা এবার সত্যি সত্যি এত খুশী হলেন যে তাঁতীর মেয়েকে তিনি বললেন, "কাল থেকে তুমি হবে আমার রানী।"

মহা ধূমধাম করে রাজার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলো তাঁতীর মেয়ের। তাঁতীর মেয়ে হলো রাজরানী। দেখতে দেখতে এক বছর পরে তাঁদের ফুটফুটে সুন্দর একটি ছেলে হলো।

এদিকে ক্ষুদে সেই বিদ্‌ঘুটে বামনের কথা রানী ভুলেই গিয়ে-

ছিলেন। বামন কিন্তু ভোলেনি। ছোট্ট রাজপুত্রের বয়স যখন মাত্র তিনদিন তখন হঠাৎ এক রাতে রাজবাড়িতে এসে হাজির হলো ক্ষুদে বামন। তিড়িং বিড়িং করে লাফাতে লাফাতে রানীকে সে বললো, "কী মেয়ে"—তারপর মস্ত এক জিভ কেটে আবার শুরু করলো, "কী রানীমা, মনে আছে কী কথা দিয়েছিলে? এবার কথা রাখো, ছেলে দাও।"

শুনে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগলেন রানী। তিনি ভাবতেই পারেননি এক বছর পরে সত্যি সত্যি ফিরে আসবে বামনটা। তার মনে থাকবে সে রাতের সেই প্রতিজ্ঞার কথা।

বামন বললো, "হুঁ হুঁ প্রতিজ্ঞা করেছিলে যখন, তখন মনে ছিলো না বুঝি, এখন কেন চোখে জল?"

উত্তর দিলেন না রানী, শুধু কাঁদতে লাগলেন আর কাঁদতেই লাগলেন। হঠাৎ বোধহয় দয়া হলো বামনের। ভুরু কুঁচকে দুচোখ সরু করে সে বললো, "আচ্ছা, বেশ মাফ করে দেবো তোমায়। তোমার ছেলে আমি নেবো না—বলতে যদি পারো তুমি কী আমার নাম, তিন দিন সময় দিলাম। পরপর রোজ তিন দিন আসবো আমি। তার মধ্যে বলতে হবে কী আমার নাম, আর—না যদি পারলে—ছেলে তুমি হারাবে—" এই না বলে লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে গেলো বামনটা।

ভাবতে বসলেন রানী—কী নাম ঐ তিন হাত বামনের—কী নাম?—কিন্তু ভেবে ভেবে কূলকিনারা কিছুই পেলেন না তিনি। চারিদিকে লোক পাঠালেন নামের খোঁজে। খোঁজ—খোঁজ—খোঁজ—কী নাম ঐ তিন হাত বিদ্‌ঘুটে বামনের।

পরদিন বামন এসে হাজির। "কী রানীমা বলো দেখি নাম কী আমার?"

"উ-জন।"

মাথা নাড়লো বামন, 'উঁ-হু—না।"

রানী বললেন, "তাহলে টম।"

"না—না" মাথা নাড়লো বামন।

"তাহলে—তা-হলে..."

এমনি করে খান দশেক নাম বললেন রানী।

"না—না—না" প্রতিবারই জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগলো বামন, "উহুঁ, হলো না, হলো না।"

পরদিনও ঘটলো একই কাণ্ড, কত নাম বললেন রানী। সাধারণ নাম ছেড়ে আজগুবি, উদ্ভট নানা ধরনের নাম। কিন্তু কোনোটাই ঠিক হলো না।

তিন দিনের দিন সকালবেলা রানীর এক চর এলো ছুটতে ছুটতে। রানীর কাছে পৌঁছে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, "পেয়েছি রানীমা পেয়েছি—সেই বিদ্‌ঘুটে বিচ্ছিরি বামনের নাম পেয়েছি।"

"কিরকম, কিরকম ?" ব্যস্ত হয়ে উঠলেন রানী।

চর বললো, "এই তো জঙ্গলের পথ ধরে ফিরছি—দেখি বড়ো বড়ো গাছগুলোর ফাঁকে আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে—একেবারে জঙ্গলের শেষ মাথায়। ভাবলাম দেখি গিয়ে ব্যাপারখানা কী। কাছে গিয়ে দেখি এক বামন নাচছে হাত-পা তুলে। গাছতলায় জ্বলছে আগুন আর আগুনের উপর কালো কড়াইয়ে কী যেন ফুটছে টগবগ করে। ঘুরে ঘুরে নাচছে বামন আর গাইছে,

"আমার নাম রামপুটিতিন
তেরে-কেটে মেরে-কেটে ধেরে-কেটে ধিন
হেরে গেলে রানী তুমি তিন তিন দিন
আমার নাম—রামপুটিতিন।"

এরপর আর কী। সে রাতে বামন যখন লাফাতে লাফাতে এলো তখন তার মুখে হাসি আর ধরে না। দাঁত বার করে সে বললো, "বলো তো দেখি নামটা আমার কী ?"

রানী বললেন, "তোমার নাম, তোমার নাম···হতে পারে কি 'রামপুটিতিন' ?"

রেগে হাত পা ছুঁড়তে লাগলো বামন। চেঁচিয়ে গর্জন করে বলতে লাগলো, "কেউ বলে দিয়েছে তোমায়—নিশ্চয়ই কেউ বলে দিয়েছে—আমার নাম রামপুটিতিন।···"

তারপর চেঁচাতে চেঁচাতে লাফাতে লাফাতে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে সেই যে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো বামন রামপুটিতিন আর কোনোদিন সে আসেনি।
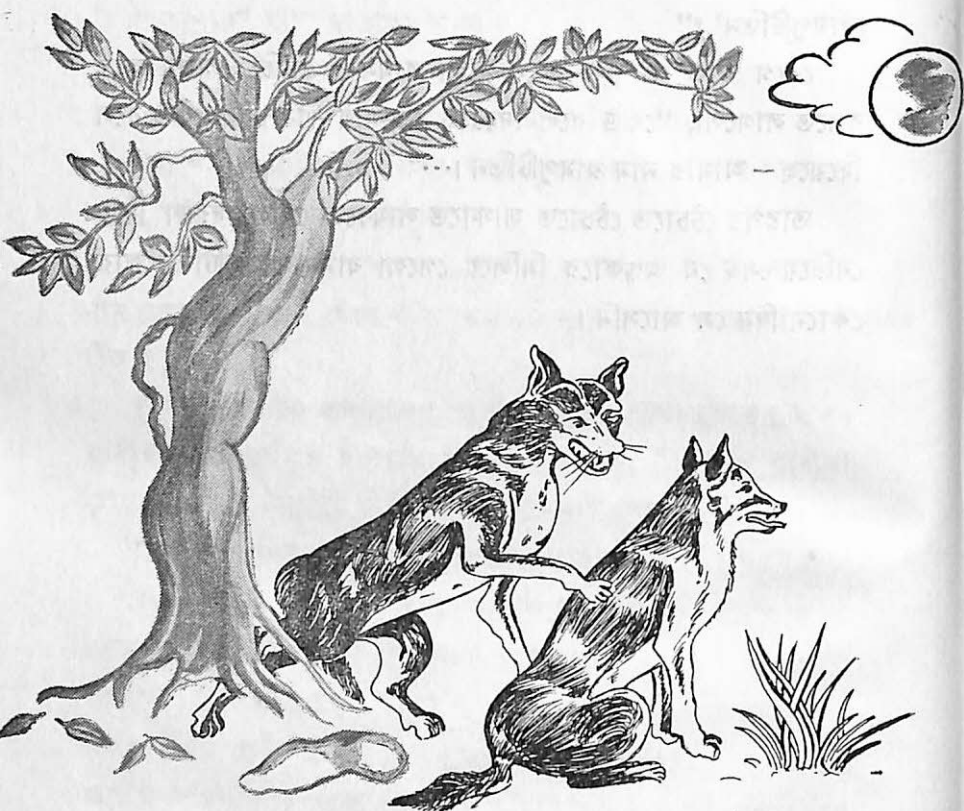
লাল শেয়াল আর পাঁশুটে নেকড়ে

জঙ্গলের এক গর্তে থাকতো পাঁশুটে রঙের লোভী এক নেকড়ে বাঘ। নেকড়ের গর্তের খুব কাছেই ছিলো লাল লোম এক শেয়ালের বাসা। নেকড়ে বাঘ ছিলো যেমনি বোকা শেয়াল ছিলো তেমনি সেয়ানা। কিন্তু হলে কী হয়, নেকড়ে বাঘের গায়ের জোর আর দাঁতের ধার দুইই অনেক বেশী। তাই শেয়াল বেচারাকে দিনরাত পাঁশুটে নেকড়ের ফাইফরমাশ খাটতে হতো। গায়ের জোরে শেয়াল যেমন নেকড়ের ধারেকাছে ঘেঁষতে পারতো না—তেমনি বুদ্ধির লড়াইয়ে

নেকড়েও শেয়ালের নাগালই পেতো না। তবু সবসময় নেকড়ের ফাইফরমাশ খাটতে খাটতে শেয়ালের বিরক্তি ধরে গিয়েছিলো।

একদিন সন্ধেবেলা জঙ্গলের পথ দিয়ে চলেছে পাঁশুটে নেকড়ে আর লাল শেয়াল। সেদিন সকাল থেকে কিচ্ছুটি খাওয়া হয়নি নেকড়ের। হঠাৎ গর্‌র্ গর্‌র্ করে উঠলো নেকড়ে—

"শোন রে শোন লাল শেয়াল
খিদেয় আমি মরলুম
খাবার খুঁজে আন রে ছুটে,
নইলে তোকে খেলুম।"

শেয়াল বললো, "এই কাছেই এক মেষপালকের ঘর নেকড়েমশাই। তার খোঁয়াড়ে ভেড়ার দুটো কচি বাচ্চা আছে। চাইলে তার একখানা চুরি করে আনতে পারি।"

"তবে যা না ছুটে", গরগরিয়ে উঠলো নেকড়ে।

চুপিচুপি একটা ভেড়ার ছানা চুরি করে নেকড়ের কাছে রেখে নিজের গর্তে ফিরে চললো শেয়াল। কে জানে—আবার কী ফরমাশ করে বসে লোভী নেকড়ে।

কচিছানাটা একেবারে চেটেপুটে খেয়ে লোভী নেকড়ে ভাবলো, "উম্—খাসা খেতে ছানাটা। শেয়াল বললো না আরেকটা ছানা আছে খোঁয়াড়ে! অন্যটাকে পেলে ভোজটা আরও জমতো আজ। যাই, ওটাকে ধরে নিয়ে আসি। শেয়াল ধারেকাছে নেই তো কী হলো। আমার গায়ে কি শেয়ালের চেয়ে কম জোর?"

গায়ের জোর তার শেয়ালের চেয়ে অনেক বেশী – কিন্তু শেয়ালের মতো অত চালাক নয় সে। খোঁয়াড়ে গিয়ে ভেড়ার ছানাটাকে সে সোজা তুলতে যাবে অমনি মা ভেড়াটা ভয়ে ম্যা-অ্যা-ম্যা-অ্যা করে ডেকে পাড়া মাথায় তুললো।

ভেড়ার চীৎকার শুনে লাঠি হাতে দৌড়ে এলো মেষপালক আর মেষপালকের বৌ। খোঁয়াড়ে একটা পাঁশুটে নেকড়ে দেখে মেষপালক

চেঁচাতে লাগলো, "নেকড়ে–নেকড়ে–।" চেঁচামেচি শুনে পাড়া-পড়শীরাও ছুটে এলো লাঠিসোটা যে যা পারলো হাতে নিয়ে। তারপর সকলে মিলে নেকড়েকে এমন পিটুনি দিলো যে খোঁড়া ঠ্যাঙে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে প্রাণ নিয়ে কোনোমতে জঙ্গলে ফিরে এলো লোভী নেকড়ে।

কিন্তু তবু লোভ তার গেলো না। দিন কয়েক পর পা-টা একটু ভালো হতেই শেয়ালকে নিয়ে আবার সে চললো জঙ্গলে ঘুরতে। জঙ্গলের শেষ মাথায় যেখানে গাঁয়ের শুরু সেখানে পৌঁছে নেকড়ে শেয়ালকে বললো,

"গর্‌র্‌গর্, গর্‌র্‌গর্
পেটে বড় খিদে–
খাবার কিছু না আনলে
তোকে খাব সিধে–"

শেয়াল বললো, "রোসো।" নাক টেনে এদিক ওদিক খানিক ঘুরে এসে সে বললো, "এই কাছেই চাষীর বাড়িতে চাষী বৌ বসে বসে পিঠে ভাজছে। তাই গোটাকয় খেয়ে পেট ভরাও নেকড়েমশাই।"

"বেশ তো তবে যা না ছুটে।" গর্‌গরিয়ে উঠলো নেকড়ে বাঘ। চুপিচুপি শেয়াল গিয়ে হাজির হলো চাষীর বাড়িতে। ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ করে পিঠে ভাজছে চাষী বৌ। রান্নাঘরের উঠোনের পেছনে জানলার নীচে দাঁড়িয়ে পিঠের গন্ধ শুঁকলো শেয়াল। –উম্-উম্। ভাজা পিঠেগুলো চাষী বৌ সাজিয়ে রেখেছে বড়ো একটা কাঠের থালায়। বারকয়েক ঘুরঘুর করে তারপর এক ফাঁকে সুযোগ বুঝে খানদশেক পিঠে মুখে তুলে নিয়ে শেয়াল দিলো এক ছুট্।

ভাজা মুচমুচে পিঠেগুলো নেকড়ের কাছে রেখে শেয়াল চলে গেলো নিজের কাজে।

–ইয়াম-ইয়াম–খাসা খেতে পিঠেগুলো। আর কটা পেলে মন্দ হতো না। ভাবলো নেকড়েবাঘ। শেয়ালটা বড্ড বেয়াকুব।

মাত্র দশখানা পিঠেতে আমার পেট ভরে ? যাই আর কটা নিয়ে আসি। গতবার ভেড়ার ছানাটা চুরি করতে গিয়ে বড্ড ঠ্যাঙানি খেয়েছি। এবার একটু সাবধানে যেতে হবে।

কিন্তু লোভী নেকড়েটা যেমনি বোকা তেমনি অসাবধানী। চাষীর রান্নাঘরে গিয়ে দেখলো থালাভর্তি মুচমুচে পিঠে ভাজা। চাষী বৌ ধারেকাছেও নেই। লোভে দুচোখ চক্‌চক্ করে উঠলো পাঁশুটে নেকড়ের। আর অপেক্ষা না করে থালা থেকে একটার পর একটা পিঠে গঁত্ গঁত্ করে খেতে শুরু করলো সে। আর তাড়াহুড়োতে অসাবধানে লেজের ধাক্কা লেগে ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ।—পেছনে রাখা কাঁচের থালাবাটি পড়ে ভেঙে খান্ খান্। আওয়াজ শুনে চাষী আর চাষী বৌ দৌড়ে এলো রান্নাঘরে। তারপর লাঠিঝাঁটা, হাতাখুন্তি হাতের কাছে যা পেলো তাই দিয়ে এমন মার মারলো নেকড়ে বাছাধনকে যে কাঁদতে কাঁদতে ভাঙা ঠ্যাঙে খোঁড়াতে খোঁড়াতে গর্তে ফিরলো লোভী নেকড়ে।

কিন্তু লোভ বলে কথা। দুদিন যেতে না যেতে মারের ব্যথা ভুলে নেকড়ে শেয়ালকে নিয়ে চললো গাঁয়ের দিকে। গাঁয়ের কাছা-কাছি পৌঁছে দুচোখ লাল করে নেকড়ে বললো, "তোর জন্য দুবার এমন মার আমি খেয়েছি যে গায়ের ব্যথা এখনও আমার ভালো করে সারেনি।" শেয়াল বললো, "বারে, আমার দোষ কী ? তুমি আর একটু সাবধান হলে এমন পিটুনি খেতে না। আমি কি পিটুনি খেয়েছি ?—বলো ?" খিদেয় তখন নেকড়ের পেট চোঁ চোঁ করছে। অত কথা তার শোনার ধৈর্য নেই। সে বললো—

"বেজায় খিদে লাল শেয়াল
আন্ খুঁজে আন্ যা খেয়াল।
আর খাবার যদি না পাবো
তোর ঘাড়টাকে আজ মট্‌কাবো।"

শেয়াল বললো, "বেশ বাবা বেশ। কসাইবাড়ির গুদামঘরে কাল

দেখেছি গামলা গামলা টাট্‌কা মাংস রেখেছে। তাই নাহয় এনে দিচ্ছি। অপেক্ষা করো এখানে।”

“উহুঁ—সেটি হচ্ছে না”, গর্‌গর্ করে উঠলো নেকড়েবাঘ, “আবার আমি ঠ্যাঙানি খাই আর কি। এবারে আমি তোর সঙ্গে যাবো। ঠ্যাঙানি খাই যদি তো তুজনে একসঙ্গে খাবো।”

“বেশ তো।”—বললে শেয়াল।

পাঁশুটে নেকড়ে আর লাল শেয়াল গিয়ে পৌঁছলো কসাইবাড়ির পেছনে। মাংসের গুদোমে আলো বাতাস ঢোকার জন্য গোল একটা গর্ত রয়েছে। তা দিয়ে গলে ভেতরে ঢুকলো শেয়াল আর নেকড়ে।

ওরে ব্বাস্ কত মাংস—সত্যি গামলা ভর্তি ভর্তি মাংস—হাপুস হুপুস খেতে শুরু করলো নেকড়ে।

অল্প খানিকটা খেয়ে শেয়াল বললো, “অত খেয়ো না নেকড়েমশাই। ধরা পড়লে তখন ছুটতে পারবে না—গর্ত দিয়ে গলতে পারবে না।”

কিন্তু কে শোনে কার কথা। লোভী নেকড়ে গপাগপ্ গপাগপ্ মাংস খেয়ে চললো। এত মাংস—তাজা মাংস—পাশে লাল শেয়াল। আজ নেকড়েকে আর পায় কে।

এদিকে খুটুর খুটুর খচরমচর আওয়াজ শুনে কসাইয়ের সন্দেহ হলো গুদামঘরে কেউ ঢুকেছে। দলবল নিয়ে মোটা মোটা লাঠি আর মস্ত এক দা নিয়ে কসাই চললো গুদামঘরে। কসাইয়ের পায়ের আওয়াজ শোনামাত্র শেয়াল গর্ত দিয়ে চোখের নিমেষে গলে বেরিয়ে গেলো। তারপর গর্ত দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললো, “বাঁচতে চাও তো এইবেলা পালাও নেকড়েমশাই।”

খেয়েদেয়ে নেকড়ের পেট তখন ফুলে ঢোল। অনেক চেষ্টা করেও ঐ গর্ত দিয়ে কিছুতেই সে গলতে পারলো না। কসাই তখন দলবল নিয়ে গুদামঘরে ঢুকে পড়েছে।

ছুটে পালাতে পালাতে শেয়াল শুনলো ধুপ্‌ধাপ্ ধুপ্‌ধাপ্ লাঠির বাড়ি আর নেকড়ের গলাফাটানো কান্না…।

দুষ্টু যাদুকর

অনেকদিন আগে ছোট্ট এক শহরের বাইরে ঘন এক জঙ্গলে থাকতো ভারী দুষ্টু এক যাদুকর। তার যাদু দিয়ে সে কেবল পরের ক্ষতি করতো। যাদুকর এখন বুড়ো হয়েছে। সব কাজ সে আর একা করে উঠতে পারে না। তাই একদিন সে বেরিয়ে পড়লো সাহায্যের খোঁজে।

চলতে চলতে চলতে চলতে দেখা এক ছেলের সঙ্গে। কাঁধে বেশ মোটাসোটা এক পুঁটুলি নিয়ে সে চলেছে শহর ছেড়ে। যাদুকর তাকে দেখে বললো, "এই যে খোকা, বলি নাম কী হে তোমার ?"

—মাথা নুইয়ে জবাব দিলে ছেলেটি, "জ্যাক।"

"তা বলি তুমি করো কী বাবা ?"

"কাজ তো কিছু করি না। তাই কাজের খোঁজে চলেছি পাশের শহরে। দেখি যদি কিছু পাই।"

যাদুকর তার ইয়া লম্বা সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে, মাথা নেড়ে বললো, "হুঁ তা, কাজ আমিও তোমাকে দিতে পারি। তবে তার আগে বলো দেখি—লেখাপড়া কিছু জানো কিনা ?"

অনেকখানি ঘাড় হেলিয়ে এক গাল হেসে জ্যাক বললো, 'হ্যাঁ, খুব জানি।"

"উহুঁ, তাহলে তো হলো না। লেখাপড়া জানা ছেলে আমার চাই না।" এই না বলে যাদুকর দাড়ি দুলিয়ে আবার হাঁটা শুরু করলো।

জ্যাক ছিলো ভারী চালাক ছেলে। যাদুকর চলে যায় দেখে চট্ করে বলে উঠলো, "একটু দাঁড়ান। আপনি কী বললেন এক্ষুনি ? —লেখাপড়া ? আপনি কি জিজ্ঞেস করছিলেন—আমি লেখাপড়া জানি কিনা ?

"হুঁ, হুঁ, তাই তো জানতে চাচ্ছিলাম, লেখাপড়া জানো ?" বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলো বুড়ো যাদুকর।
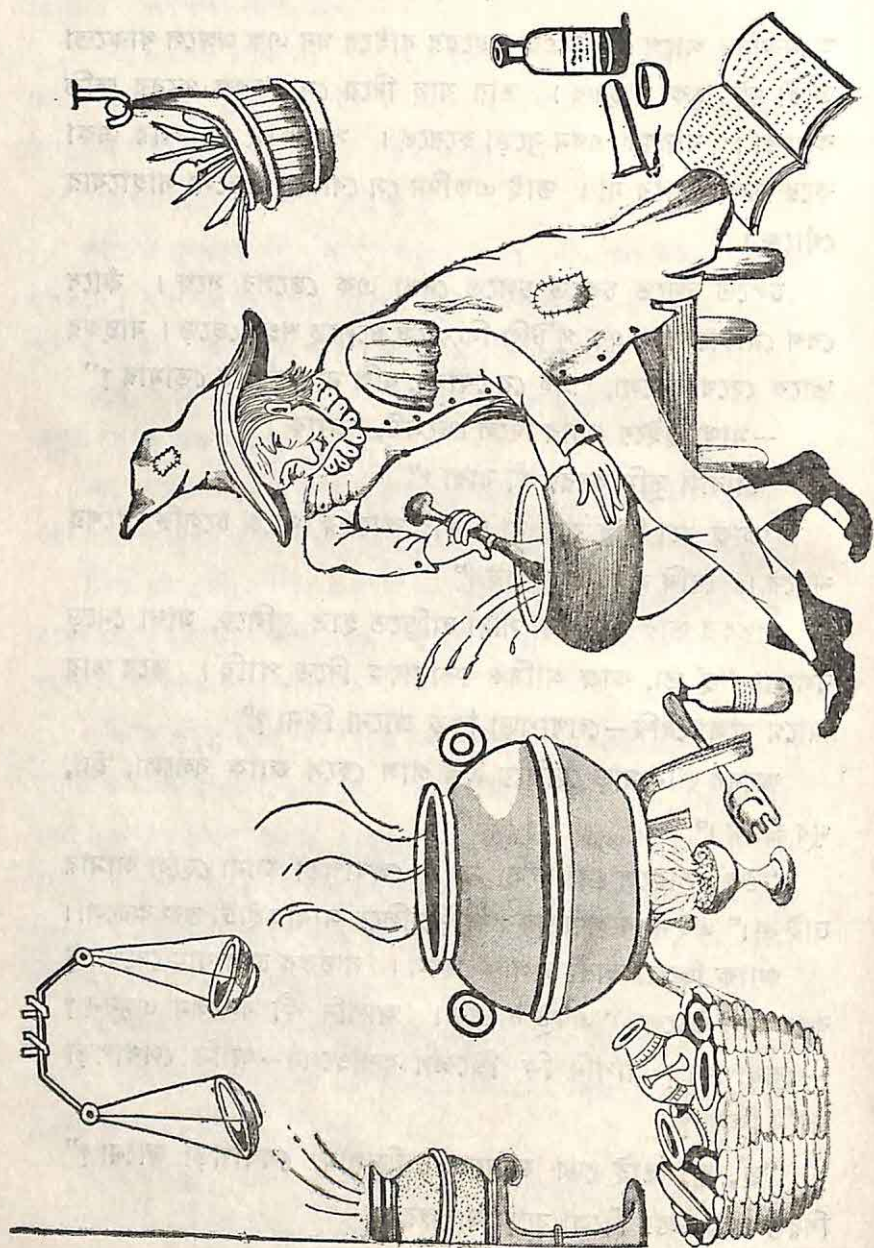
মাথা ঝাঁকিয়ে একগাল হেসে জ্যাক বললো, "ও—তাই বলুন। আমি শুনলাম খেলাধুলো। না না, লেখাপড়া আমি কিছুই জানি না তাই তো মা বললো—মুখ্যু ছেলে কোথাকার—দূর হয়ে যা বাড়ী থেকে। —এই না বলে তাড়িয়ে দিলো।" অ্যাঁ-অ্যাঁ-উঁ-উঁ বলতে বলতে কান্না জুড়ে দিলো জ্যাক।

খুশী হয়ে বুড়ো যাছুকর জ্যাকের পিঠ চাপড়ে বললো, "নাও, নাও, কান্না থামিয়ে তাহলে চলো আমার সঙ্গে। আমার কারখানায় তোমার জন্য অনেক কাজ রয়েছে। চলো চলো।"

আহ্লাদে ডগমগ জ্যাক চললো বুড়ো যাছুকরের সঙ্গে। যেতে যেতে যেতে যেতে তারা শহর ছাড়িয়ে ঢুকলো ঘন জঙ্গলে। কী অন্ধকার জঙ্গল। ঠাসঠাসি গাছে দিনের বেলাতেও সেখানে সূর্যের আলো ঢোকে না। চলতে চলতে যাছুকর এসে থামলো প্রকাণ্ড এক বাড়ীর সামনে। একমুখ হেসে দাড়ি দুলিয়ে জ্যাককে বললে, "এই হলো আমার কারখানা। আজ থেকে এই হলো তোমারও আস্তানা। কী পছন্দ তো? হেঁ হেঁ। খাবেদাবে আরামে থাকবে। আর দরকার-মতো আমার কাজে একটু সাহায্য করবে। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ।..."

কারখানা দেখে জ্যাক তো অবাক। ঘরের এক কোণে মস্ত এক উন্নুনে জ্বলছে গনগনে লাল আগুন। তার ওপর প্রকাণ্ড এক তামার হাঁড়িতে টগ্‌বগিয়ে ফুটছে জলের মতো সবুজ রঙের কী একটা জিনিষ। এখানে-সেখানে ছড়িয়ে আছে নানা ধরনের জিনিষ – পাথরের মস্ত খল নুড়ি, নানারকম পেতলের বাসন-কোসন, ছাঁকনি, কাচের নল, শিশি বোতল, আরও কত কী। আর একপাশে বিরাট এক আলমারী ভরা রাশি রাশি বই।

জ্যাক তো আর জানে না এই বুড়ো আসলে এক যাছুকর। সে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো যার দেরাজে এত বই তিনি না জানি কত পণ্ডিত লোক।

কিন্তু—জ্যাকের হঠাৎ খট্‌কা লাগলো—"তাহলে আমি লিখতে

পড়তে জানি শুনে তিনি আমাকে কাজ দেবেন না বললেন কেন ? নাঃ—নিশ্চয়ই কোথাও কিছু গোলমাল আছে। ব্যাপারটা মোটেই ভালো ঠেকছে না।”

আগেই তো বলেছি, জ্যাক ছিলো খুব বুদ্ধিমান ছেলে। দিনকয়েক যেতে না যেতেই সে বুঝতে পারলো দুষ্টু এক যাদুকরের কারখানায় কাজ করছে সে। এ-ও বুঝলে যে যাদুকর পরের অপকার আর অনিষ্ট করতে তার যাদুবিদ্যেকে কাজে লাগায়। জ্যাক ঠিক করলে সে-ও যাদু শিখবে। তারপর জব্দ করবে ঐ দুষ্টু যাদুকরকে।

প্রতিরাতে যাদুকর ঘুমিয়ে পড়লে কিংবা দুপুরে যাদুকর বাইরে বেরোলে লুকিয়ে লুকিয়ে দেরাজের ঐ মোটা মোটা বইগুলো পড়তে শুরু করলো জ্যাক। অল্পদিনে এভাবে শত শত যাদুবিদ্যে জ্যাক শিখে নিলো। মনে মনে বললো, “এবার বুঝেছি কেন আমি লেখা-পড়া জানি শুনে যাদুকর আমাকে কাজ দিতে চায় নি। যাদুকর মোটেই চায় নি তার বইপত্র পড়ে যাদুগুলো আমি সব শিখে নিই। সে কেবল চেয়েছিলো বোকাসোকা মুখ্যু একটা ছেলে, যে কেবল তার ফাইফরমাশ খাটবে।”

এক দুপুরে কোলের ওপর মোটা একটা বই খুলে রেখে একমনে পড়তে পড়তে দাঁত কিড়মিড়িয়ে উঠলো জ্যাক, “দাঁড়াও বাছাধন, তোমার দুষ্টুমি আমি···”

···“ওরে দুষ্টু মিথ্যুক ছেলে···” বাজপড়ার মতো হুঙ্কারে চমকে উঠলো জ্যাক। খেয়ালই করে নি কখন বুড়ো যাদুকর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে—“তবে রে, তুই নাকি লেখাপড়া জানিস্ না ? —মিথ্যে-বাদী—আমার যাদুর বইয়ে হাত ? —দাঁড়া—”, হাত বাড়িয়ে যেই না যাদুকর জ্যাককে ধরতে যাবে, অমনি জ্যাক চট্‌পট্ বলতে শুরু করে দিলো নতুন শেখা যাদুর মন্ত্র···

“তুক্ তাক তাক ভেলকিবাজি, তিড়িং বিড়িং ডাকি
বাবুই, চড়ুই, ময়না, টিয়ে ধর তো আমায় দেখি···”

হুস করে জ্যাক ছোট্ট এক টিয়ে পাখী হয়ে ফুড়ুৎ করে উড়ে গেলো আকাশে। যাদুকর ছাড়বে কেন? —সে-ও এক মস্ত ঈগল পাখী হয়ে ছোট্ট টিয়েকে তাড়া করলো আকাশে। বিপদ দেখে জ্যাক আর এক মন্ত্র আওড়ালো…

"লাগ ভাল ভাল ভেলকিবাজি যাদুর হাতে পাঁচ
তিন ছয় ছয় ঘিচিং কুটুক জলের ভেতর মাছ—"

টুপ—আকাশ থেকে মাছ হয়ে জ্যাক টুপ করে পড়লো পুকুরের জলে। যাদুকর হয়ে গেলো আরও মস্ত এক মাছ। শোঁ-শোঁ করে জল কেটে সে তেড়ে গেলো জ্যাকের দিকে। জ্যাকও হাল ছাড়লো না। আরও বিরাট এক মাছ হয়ে সে যাদুকরের পেছু ধাওয়া করলো। যাদুকর সঙ্গে সঙ্গে এক গমের দানা হয়ে পুকুর পাড়ে গাছের ফোকরে গিয়ে লুকলো। সঙ্গে সঙ্গে জ্যাক বললো,

"দানা দানা দানা
মহা ভোজখানা
ঠক ঠক ঠক শব্দ
এবার তুমি জব্দ—"

চোখের নিমেষে জ্যাক হয়ে গেলো এক কাঠঠোকরা পাখী। ঠক ঠক ঠক—যাদুকর আবার যাদুর মন্ত্র বলার আগেই গাছের ফোঁকরে ঠোঁট ঢুকিয়ে গপাৎ করে গমের দানাটা খেয়ে ফেললো জ্যাক। ব্যস, আর কি, দুষ্টু যাদুকরের ভবলীলা ওখানেই শেষ হয়ে গেলো।

—এরপর ঐ যাদুর কারখানার মালিক হয়ে বাকী জীবনটা সে সুখে কাটাতে লাগলো।

তবে এখানে একটা কথা তোমাদের জানিয়ে রাখি। সে তার যাদু দিয়ে জীবনে কক্ষনো কারও কোনো ক্ষতি করেনি। —বরং কীভাবে কার ভালো করা যায় তার চেষ্টাই সে সারা জীবন ধরে করেছিলো।

ব্যাঙ রাজকন্যা

এক দেশে থাকতেন এক রাজা। রাজার ছিলো তিন ছেলে। রাজা বুড়ো হয়ে পড়েছেন। একদিন তাই তিন ছেলেকে ডেকে রাজা বললেন, "তোমাদের মধ্যে একজনকে আমি রাজা করে যেতে চাই। তোমাদের মধ্যে যে আমাকে সবচেয়ে নরম তুলতুলে দশ হাত কাপড় এনে দিতে পারবে তাকেই আমি রাজমুকুট পরিয়ে দেবো।"

"এ আর এমন কী কঠিন কাজ ?" একসঙ্গে হৈ চৈ করে উঠলো তিন রাজপুত্র।

রাজা বললেন, "দাঁড়াও, দাঁড়াও, অত হৈ চৈ কোরো না। মন দিয়ে আগে শোনো কী বলি। ঐ দশ হাত কাপড় এতই নরম আর মোলায়েম হতে হবে যে তা আমার এই আংটির মধ্যে দিয়ে অনায়াসে গলে যাবে, বুঝেছো ?" এই বলে রাজা তার আঙুলের আংটিখানা খুলে তিন রাজপুত্তুরকে দেখতে দিলেন। রাজপুত্তুরদের মুখগুলো উঠলো গম্ভীর হয়ে। রাজা মুচকি হাসলেন। দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন,

"কী ভাবছিলে খুব সহজ কাজ, তাই না ?" যাও বেরিয়ে পড়ো তিনজনে। দেখি কার ভাগ্যে জোটে এই রাজমুকুট।" বেরিয়ে পড়লো তিন রাজপুত্র নরম তুলতুলে কাপড়ের খোঁজে। বড়ো দুই রাজপুত্র যেখানে যতরকম নরম রেশম পশম আর মখমলের কাপড় পেলো কিনে কিনে প্যাটরা বোঝাই করলো।

ছোটো রাজপুত্র যে পথে হাঁটা শুরু করেছিলো সে পথে মাইলের পর মাইল কেবল ঘন জঙ্গল। ধারে কাছে ছোটোখাটো শহর তো দূরের কথা কোনো গ্রাম অবধি চোখে পড়ে না। হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে সন্ধের সময় ক্লান্ত হয় ছোটো রাজপুত্তুর বসলো গিয়ে এক ডোবার ধারে। গালে হাত দিয়ে মন ভার করে ছোটো রাজপুত্তুর ভাবছিলো কোথায় পাবে এই আশ্চর্য নরম কাপড়। হঠাৎ ডোবার পাশ থেকে কালো রঙের বিচ্ছিরি এক কোলাব্যাঙ গাল ফুলিয়ে ডেকে উঠলো, "গ্যাংর গ্যাংর গ্যাং, গ্যাংর গ্যাংর গ্যাং" তারপর অনেকটা মানুষের ভাষায় বললে,

গ্যাংর গ্যাংর গ্যাং,
কে মেরেছে ল্যাং ?
হাঁড়ি মুখে ভাবছটা কী
গ্যাংর গ্যাংর গ্যাং।"

অতিকষ্টে মুখে হাসি এনে রাজপুত্তুর বললে, "আমার কেন মুখভার সে কথা তোমায় বলে লাভ কী ? পারবে তুমি আমাকে সাহায্য করতে ?" ব্যাঙ বললে, "বলোই না শুনি ব্যাপারখানা কী ?" ছোটো রাজপুত্তুর তখন বাবার হুকুমের কথা ব্যাঙকে খুলে বললো।

সব শুনে বিরাট এক হাঁ করে বিচ্ছিরি রকম হাসতে হাসতে কোলাব্যাঙ বললো, "এই ব্যাপার ? এর জন্য তোমার এত ভাবনা ? দাঁড়াও, আমি এক্ষুনি আসছি।"

ভুস্ করে ডোবার জলে ডুব দিলো কোলাব্যাঙ। একটু পরে উঠে এলো মুখে একফালি ছোট্ট কাপড় নিয়ে। কাপড়ের ফালিটা

রাজপুত্তুরের হাতে দিয়ে ব্যাঙ বললে, "কাপড়টা পকেটে নিয়ে এই-বার সোজা বাড়ী ফিরে যাও। তবে একটা কথা, বাড়ী পৌঁছনোর আগে এ কাপড় খবরদার পকেট থেকে বের করবে না।" —বলেই একলাফে ঝপাং করে ডোবার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্যাঙ কোথায় চলে গেলো।

হতবাক রাজপুত্তুর কাপড়ের টুকরোটা নিয়ে ফিরে চললো রাজপ্রসাদে। এদিকে রাজবাড়ীতে তখন তুমুল হৈ চৈ। বড়ো দুই রাজপুত্র নানারকমের কাপড় রাজার হাতে তুলে দিচ্ছে। কিন্তু কোনোটাই তাঁর আংটির মধ্যে দিয়ে গলছে না। ছোটো রাজপুত্তুর ভয়ে ভয়ে ছোট্ট কাপড়ের টুকরোটা পকেট থেকে বের করলো। কিন্তু—একী? —যত টানছে কাপড় ততই বড়ো হচ্ছে। ছোট্ট কাপড়ের ফালিটা রাতারাতি দশ হাত লম্বা হয়ে গেছে। আর আজব কাণ্ড—ঐ দশ হাত লম্বা কাপড়খানা দিব্যি রাজার আংটির মধ্যে দিয়ে গলে গেলো!

রাজা খুশী হয়ে বললেন, "এবার তোমাদের আরও এক কাজ বাকী। তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করে আনতে পারবে সেই পাবে রাজ সিংহাসন।"

তখুনি বেরিয়ে পড়লো তিন ভাই সুন্দরী বৌ-এর খোঁজে। বড়ো দু ভাই চললো আশপাশের বড়ো বড়ো রাজ্যে। বেচারা ছোটো রাজপুত্তুর—কোন্‌দিকে যাবে ভেবে ঠিক করতে না পেরে চললো আগের মতো সেই জঙ্গলের দিকে। ভাবতে লাগলো—কোলাব্যাঙ কি এবার আর আমায় সাহায্য করতে পারবে? ডোবার ধারে সবে পৌঁছেছে রাজপুত্তুর, শুনলো হেঁড়ে গলায় সেই চেনা ডাক,—

"গ্যাংর গ্যাং, গ্যাংর গ্যাং—বলি আবার কেন গোমড়া মুখ? এবার তোমার কিসের দুখ?"

"বাবার আবার নতুন হুকুম...", সব কথা ব্যাঙকে খুলে বললো ছোটো রাজপুত্তুর।

"ওহো এই ব্যাপার ? তাই এত মুখভার ? যাও বাড়ী ফিরে যাও। তবে সাবধান যেতে যেতে কিন্তু একবারের বেশী পিছু ফিরে চাইবে না। মনে থাকে যেন মাত্র একবার। সুন্দরী বৌ তোমার পেছনে পেছনে যাবে।

ফিরে চলেছে ছোটো রাজপুত্তুর। হঠাৎ শোনে পেছনে ঘসর ঘসর অদ্ভুত এক আওয়াজ। ফিরে তাকিয়ে দেখে একটা কুমড়োর খোলার ভেতর সেই কালো কদাকার কোলাব্যাঙটা বসে বিশ্রী রকম হাসছে
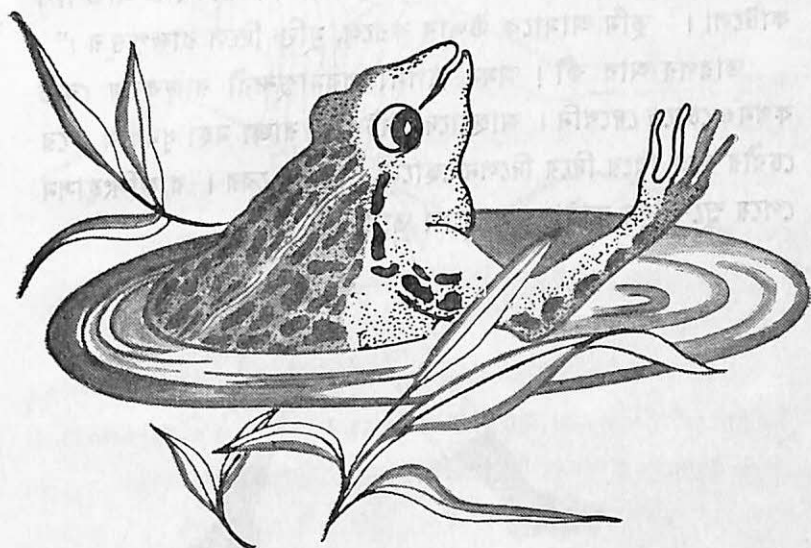
"গ্যাংর গ্যাংর গ্যাং" আর কুমড়োটা টেনে নিয়ে চলেছে ছটা গেছো ইঁদুর। রাজপুত্তুর ভাবলো, 'এই নাকি আমার সুন্দরী বৌ ?' কিন্তু কী বলবে কী করবে ভেবে না পেয়ে চুপচাপ পথ হাঁটতে লাগলো সে। আর পেছন ফিরে তাকাবার যো নেই। ব্যাঙের হুকুম।

রাজবাড়ীর ফটকে পৌঁছতে সে অবাক কাণ্ড। পেছনে হঠাৎ ঘোড়ার পায়ের খটাখট আওয়াজ। আরে, এতগুলো ঘোড়া এলো কোত্থেকে ?—মুখ ফিরিয়ে যেই না তাকিয়েছে ছোটো রাজপুত্তুর—

এ কী ?—কোথায় সেই কুমড়ো, কোথায় সেই বিচ্ছিরি কোলাব্যাঙ, আর কোথায়ই বা সেই ছ-ছটা গেছো ইঁদুর ? ফটকে এসে দাঁড়িয়েছে তেজী ছ ঘোড়ায় টানা চমৎকার এক জুড়িগাড়ী। ভেতরে বসে আছে অপরূপ সুন্দরী এক মেয়ে। রাজপুত্রের ভ্যাবাচাকা মুখ দেখে মিষ্টি হেসে মেয়েটি বললে, "আমি তোমার বন্ধু, সেই ডোবার কোলা-ব্যাঙ। আমার আসল নাম—'চেরী।' আমি ভিনদেশী এক রাজার মেয়ে। এক ডাইনীর অভিশাপে আজ পাঁচ বছর আমি কোলাব্যাঙ হয়ে ছিলাম। আজ সেই পাঁচটি বছর পূর্ণ হলো। ডাইনীর অভিশাপ কাটলো। তুমি আমাকে উদ্ধার করলে, মুক্তি দিলে রাজপুত্তুর।"

তারপর আর কী ! অমন রূপসী পরমাসুন্দরী রাজকন্যে কেউ কখনও চোখে দেখেনি। আহ্লাদে আটখানা রাজা মহা ধূমধাম করে চেরীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন ছোটো রাজপুত্তুরের। রাজসিংহাসন পেয়ে সুখে দিন কাটাতে লাগলো তারা।

গাধা, লাঠি, রবিন

এক গাঁয়ে থাকতো এক গরীব চাষী। চাষীর ছিলো এক ছেলে, নাম তার রবিন। রবিনের বুদ্ধিশুদ্ধি ছিলো একটু কম। তবে একটু মাথামোটা হলেও রবিনের মনটা কিন্তু ছিলো খুব ভালো। পরের উপকার করতে সবসময়ে ছুটে যেতো রবিন।

কিন্তু হলে কী হয়। ঐ যে বললাম মাথা মোটা ছিলো তার।

বাবা তাই দিনরাত রবিনকে গালমন্দ করতেন। বোকা, বুদ্ধু, গাধা, মাথামোটা এমনি কত কথা যে তাকে দিনরাত্রি শুনতে হতো তার লেখাজোখা ছিলো না।

একদিন মনের দুঃখে রবিন বেরিয়ে পড়লো বাড়ী ছেড়ে। ঠিক করলো অনেক পয়সা রোজগার করতে পারলে তবেই সে আবার বাড়ীতে ফিরবে—না হলে নয়। বাবা তাকে দিনরাত বলেন বোকা—বোকা—বোকা। এবারে অনেক পয়সা রোজগার করে এনে বাবাকে তাক লাগিয়ে দেবে সে।

কিন্তু এ গ্রাম ও গ্রাম অনেক ঘুরেও কোনো কাজ জোটাতে পারলো না রবিন। একদিন আনমনা হয়ে বনের পথ ধরে সে চলেছে। হঠাৎ ধাক্কা খেলো এক কুঁজো বুড়ির সঙ্গে। ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরা বুড়ি চলেছিলো একরাশ শুকনো ডালপালা নিয়ে। রবিনের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ডালাপালাগুলো ছড়িয়ে পড়লো পথের চারধারে। গজগজ করে উঠলো কুঁজো বুড়ি, "দিলি তো, দিলি তো ফেলে ? বলি চোখ দুটো থাকে কোথায় ? অ্যাঁ ?"

থতমত খেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলো রবিন, "কিছু মনে কোরো না বুড়িমা। ইস্...বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে। সত্যি, কী সব আবোল তাবোল ভাবতে ভাবতে পথ চলছিলাম। মনটা খুব খারাপ ছিলো কিনা। তুমি কিছু ভেবো না। সরো, আমি এখুনি সব কুড়িয়ে দিচ্ছি। পৌঁছে দিচ্ছি তোমার বাড়ীতে।"

ঝটপট শুকনো ডালপালাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে রবিন চললো বুড়ির পিছু পিছু। পথের একেবারে শেষ মাথায় যেখানে বনের শুরু, সেখানে বুড়ির বাড়ী। বাড়ীতে পৌঁছে উঠোনটা দেখিয়ে বুড়ি বললো, "নে, এবারে রাখ্ এখানে।"

ডালপালাগুলো নামিয়ে রেখে রবিন আবার বললো, "আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো বুড়িমা। আর কখনও এমনটা হবে না।"

"তা বলি, করিস কী তুই ?" বুড়ি জিজ্ঞেস করলো।

“কিছুই না বুড়িমা। কাজ খুঁজতে বেরিয়েছি। পাই নি এখনও।”

“কাজ করবি আমার কাছে? কাজ অবশ্য কিছুই না। খাবি দাবি, থাকবি আর এই আমার ফাইফরমাশ খাটবি। একবছর মন দিয়ে কাজ করলে তোকে ভালো মাইনে দেবো। তবে হ্যাঁ, একবছরের মধ্যে কিন্তু কোনো মাইনে চাইতে পারবি না। কী, রাজী তো বল্?”

“নিশ্চয়ই রাজী—একশো বার রাজী”, আহ্লাদে একগাল হেসে উত্তর দিলো রবিন। এ তো আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া—রবিন ভাবলো। একটা বছর মন দিয়ে বুড়ির কাজকর্ম করলো সে।

বছর শেষে ছাইরঙা একটা বেঁটেখাটো গাধা এনে বুড়ি রবিনকে দিয়ে বললো, “এই নে—এই হলো তোর এক বছরের কাজের পাওনা।”

রবিন তো হাঁ। হাসবে কি কাঁদবে সে ভেবে পেলো না। ফ্যাল ফ্যাল করে গাধাটার দিকে সে তাকিয়ে আছে দেখে খ্যানখ্যানে গলায় হেসে উঠলো বুড়ি, “হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ—কিরে?—বলি কিরে মন ভরছে না বুঝি? তা তো ভরবেই না। ভরবে কেন? কিন্তু—হ্যাঁ, বলি শোন্, এ কিন্তু যে-সে গাধা নয়—সাধারণ গাধা নয়। পরখ করেই দেখ। দেখ না। গাধার বাঁ কানটা বেশ ভালো করে মলে দে। দে-না। তারপর দেখ কী হয়। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ…।”

বোকার মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো রবিন।

তাড়া দিয়ে উঠলো বুড়ি, “আরে হলো কী? দাঁড়িয়ে রইলি কেন? দে দে, বাঁ কানখানা মলে দে ভালো করে।”

বুড়ির কথা মতো গাধার বাঁ কানটায় মোচড় দিতেই গাধাটা বিকট হেঁড়ে গলায় ডেকে উঠলো গ্যা গ্যা করে। আর তার হাঁ মুখ থেকে ঝরঝর করে ঝরে পড়লো একরাশ সোনারুপোর মোহর।

রবিন বোয়াল মাছের মতো মস্ত এক হাঁ করে সেদিকে চেয়ে আছে দেখে বুড়ি তার পিঠে আস্তে করে একটা চাপড় মারলো।

বললো, "কী রে খুশি তো এবার? যা সাবধানে বাড়ী যা এখন। গাধাটা হারাস না যেন।"

আহ্লাদে আটখানা রবিন গাধা নিয়ে ফিরে চললো নিজের গাঁয়ে। বাবা নিশ্চয়ই আর বোকাবুদ্ধু বলে গালমন্দ করবেন না। যেতে যেতে এক গাঁয়ে এসে সন্ধে হলো। কাছেই একটা সরাইখানা। রবিন ঠিক করলো রাতটা এখানে কাটিয়ে কাল সকালে আবার হাঁটা শুরু করবে। গাধাটাকে নিয়ে সে সোজা ঢুকে গেলো সরাইখানার মালিকের ঘরে। হাঁ হাঁ করে উঠলো মালিক, "আরে, আরে, করো কি করো কি—গাধাটাকে সোজা ঘরে ঢুকিয়ে এনেছো? কেমন আক্কেল হে তোমার? যাও এটাকে বাইরে রেখে এসো আগে।

ব্যস্ত হয়ে রবিন বললো, "ইয়ে—এটা কিন্তু যে-সে গাধা নয়। মানে বাইরে রাখলে এটা যদি হারিয়ে যায়?"

ভেংচে উঠলো সরাইখানার মালিক, "এঃ—হারিয়ে যায়। —হারিয়েই যায় যদি তো এটাকে নিয়ে মাঠেই শুয়ে থাকো না। সরাইখানায় এসেছো কেন? না না, ওসব হবে না। আমার সরাই-খানায় যদি থাকতে চাও তো গাধাটাকে পেছনে খোঁয়াড়ের পাশে বেঁধে রেখে এসো। আর হ্যাঁ, পয়সা আমার আগে চাই কিন্তু। তবেই থাকতে দেবো।

"বেশ"—রবিন চললো গাধাকে খোঁয়াড়ের পাশে বেঁধে আসতে।

সরাইখানার মালিক ছিলো ভারী দুষ্টু। রবিন যেতে না যেতেই সে ভাবলো ঐ গাধাটা সম্বন্ধে একটু খোঁজ খবর নিতে হবে। ছেলেটা বললো, এ যে-সে গাধা নয়—কেন বললো? —নিশ্চয়ই কোনো একটা ব্যাপার আছে। পেছনের জানলার একটা ফুটোতে চোখ রেখে বসলো সে। দেখাই যাক না ছেলেটা কী করে তার ঐ আদরের গাধাকে নিয়ে। এরপর যা দেখলো তাতে নিজের দু-চোখকে বিশ্বাসই করতে পারলো না সরাইখানার মালিক। বেশ

করে গাধার কান মোচড়াচ্ছে রবিন আর ঝরঝর ঝরঝর সোনা আর রুপোর মোহর ঝরে পড়ছে গাধার মুখ থেকে।

হুম্ ঠিক বটে, এ গাধা যে-সে গাধা মোটেই নয়।

লোভে চকচক করে উঠলো তার চোখ দুটো। মনে মনে একটা বুদ্ধি আঁটলো সে। খেয়ে দেয়ে যখন রবিন ঘুমিয়ে পড়েছে তখন চুপিচুপি ঐ যাদু-করা গাধাটা সরিয়ে নিয়ে সেখানে হুবহু একরকম দেখতে একটা গাধা রেখে দিলো সে। রবিন কিছুই জানতে পারলো না।

পরদিন সকালে বাড়ী পৌঁছেই হাঁকডাক শুরু করে দিলো রবিন, "বাবা, বাবা শিগগিরি এসো। তোমার বোকা ছেলে কী এনেছে দেখো।"

"হুঁ—একটা গাধা! তাই নিয়ে এত হৈ চৈ? এর বেশি কিছু আনার ক্ষমতা যে তোর হবে না তা জানতাম। তা এ গাধাটাকে নিয়ে আমি এখন করবটা কি শুনি?"—রেগেমেগে চাষী বললো।

"আহা, শোনোই না। এমন গাধা তুমি জন্মেও দেখো নি বাবা। ওর বাঁ কানটা আচ্ছা করে মলে দাও। তারপর দেখো না কী হয়।"

সত্যি কিছু হয় কিনা দেখবার জন্যে যেই না গাধাটার কান মলেছেন তিনি, ব্যস আর যায় কোথায়? গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে, চার পা তুলে লাফিয়ে জোর এক কামড় বসালো গাধাটা রবিনের বাবার হাতে আর পেছনের দুপায়ে কসালো জোর এক লাথি। রাগে আগুন হয়ে তিনি রবিনের কানদুটো ধরে দিলেন আচ্ছা করে মলে। বললেন, "তবে রে হতচ্ছাড়া ছেলে। চালাকির আর জায়গা পাস নি! আমার সঙ্গে ফাজলামি! বেরো—বেরো বাড়ী থেকে।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে মনের দুঃখে পথ চলতে শুরু করলো রবিন। মনে মনে বললো—এ নিশ্চয়ই ঐ সরাইখানার মালিকের কারসাজি।

খানিকদূর গিয়ে রবিন দেখে অদ্ভুত চেহারার এক বুড়ো বামন

কোদাল দিয়ে একটা বড়ো গাছ কাটার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। কিন্তু বেচারা বেঁটে আর ছোটোখাটো বলে কিছুতেই গুঁড়িতে ঠিকমতো কোপ লাগাতে পারছে না। রবিন বললো, "আমাকে দাও না আমি কেটে দিচ্ছি।"

গাছ কাটা হয়ে গেলে খুশি হয়ে বুড়ো বামন রবিনকে ঠিক তার মতোই বেঁটেখাটো আর মোটাসোটা একটা বাঁশের লাঠি দিয়ে বললো, "তোর মনটা বড়ো ভালো – তোকে ভারী ভালো লেগেছে আমার। এই লাঠিখানা রাখ তুই। এ লাঠি যে-সে লাঠি নয় কিন্তু। একে বলবি কেবল 'লাঠি মার্ ছুমাছুম্ মার্' – ব্যস্ দুষ্টু লোক আর পালাবার পথটি পাবে না।"

"হয়েছে – ঠিক হয়েছে", রবিন মনে মনে বললো, "ঐ সরাইখানার মালিককে এবারে দেখাচ্ছি মজা।"

বুড়ো বামনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা সরাইখানার দিকে চললো রবিন। পৌঁছেই জোর গলায় হাঁক দিলো সে – "এই যে মালিক-মশাই, ভালো যদি চাও তো আমার গাধাটা ফিরিয়ে দাও এখুনি।"

চোখ কপালে তুলে মালিক বললো, "তোমার গাধা ? আমি তার কী জানি ? এখানে মেলা ঝামেলা করতে এসো না। ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। যাও যাও ভাগো এখান থেকে।"

"বটে – ভালো হবে কি না হবে এখুনি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।" – হাতের লাঠিটা বার দুয়েক ঘুরিয়ে রবিন বললো, "এই লাঠি মার্ তো –

লাঠি মার্ ছুমাছুম্ মার্ – লাঠি মার্ ছুমাছুম্ মার্
চোর মালিক দুষ্টু মালিক – নেই কোনো তোর ছাড়্
লাঠি মার্ ছুমাছুম্ মার্ – লাঠি মার্ ছুমাছুম্ মার্।"

ব্যস্ শুরু হয়ে গেলো লাঠির মার। ধুমাধুম – ছুমাছুম সে কী মার ! মারের চোটে সরাইখানার মালিকের প্রাণ প্রায় বেরিয়ে যাবার যোগাড়।

শেষমেশ হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো মালিক। কাঁদতে কাঁদতে বললো, "ফিরিয়ে নাও ফিরিয়ে নাও তোমার গাধা—মারকুটে লাঠিটাকে এবার থামতে বলো। উফ্ মারের চোটে আমার হাড়-গোড়গুলো সব ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে। থামাও লাঠি··· দোহাই তোমার।"

লাঠি থামালো রবিন। সরাইখানার মালিক ফিরিয়ে দিলো আশ্চর্য সেই গাধাটাকে। আর নিজের গাধা পেয়ে খুশীতে ডগমগ হয়ে নিজের গাঁয়ে ফিরে গেলো রবিন। এরপর জীবনের বাকী দিনগুলো মহাসুখে কাটিয়েছিলো সে।

পরীরাজার উপহার

এক দর্জি আর এক স্যাকরা চলেছে ভিন্‌গাঁয়ে কিছু বাজার সওদা করতে। তাদের গাঁ থেকে পাশের গাঁ অনেক দূরের পথ। তুজনে চলেছে বনের মধ্যে দিয়ে উঁচুনীচু পায়ে-চলা পাহাড়ী রাস্তা বেয়ে।

সূর্য তখন ডুবে গেছে। আকাশ কালো করে সন্ধে নামছে। বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা উত্তুরে হাওয়া বইছে। পাহাড়ী জঙ্গলে বুনো লতাপাতায় খস্‌খস্ খস্‌খস্ আওয়াজ তুলে হাওয়া বইছে শন্‌শন্ শন্‌শন্। তারই মধ্যে হঠাৎ অবাক হয়ে স্যাকরা আর দর্জি শুনতে পেলো মিহিগলায় মিষ্টি সুরের অদ্ভুত একটা আওয়াজ ভেসে আসছে। মিষ্টি তবে কেমন একটা একঘেঁয়ে সুর "টিকিটি টিকিটি টা-টা — লালা লালা লালা লা…" আর তার সাথে গমগমে কিন্তু মিষ্টি একটা ঢাকের শব্দ "ডুডুম ডুডুম ডুম — ডুডুম ডুডুম ডুম।"

দু বন্ধু মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো। অদ্ভুত এই গান আর বাজনার আওয়াজ কেমন যেন যাদুভরা। শুনতে শুনতে ওদের এতখানি পথ চলার কষ্ট, খিদে, তেষ্টা সব কোথায় উবে গেলো। শরীরটা কেমন হাল্‌কা আর ঝরঝরে হয়ে গেলো। আওয়াজটা ওদের সমানেই কাছে, আরও কাছে টানতে লাগলো।

সামনের ঢালু পথটা দিয়ে নেমে ওরা দেখলে আজব কাণ্ড। আকাশে তখন গোল থালার মতো বিরাট চাঁদ উঠেছে। চারপাশে উঁচু উঁচু পিপুল গাছ। মাঝখানে বেশ খানিকটা খোলা জায়গায় একদল ক্ষুদে ক্ষুদে মানুষ প্রাণ খুলে নাচছে। দর্জি আর স্যাকরা একটা গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো।

ক্ষুদে মানুষগুলোর পিঠে সাদা ফিন্‌ফিনে একজোড়া করে ডানা। মাকড়সার জালের মতো পাতলা পোষাক তাদের গায়ে। ঘণ্টার মতো টুংটাং গলার স্বর তুলে ওরা গাইছে: "টিকিটি টিকিটি টিকিটি টা— টিকুটি টিকুটি টা।" সেই সঙ্গে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে তাদের সে কী নাচ। আর ঢাক বাজাচ্ছে যে ক্ষুদে লোকটি—ডুডুম ডুডুম ডুম—ডাডুম ডাডুম ডুম—ডেডেম ডেডেম ডা—অদ্ভুত তার পোষাক। টকটকে লাল, তাতে কালো আর সাদায় বিচিত্র নক্‌শা আঁকা। আর একপাশে কাটা একটা ওক গাছের গুঁড়ির ওপর বসে আছে চেহারায় একটু বড়োসড়ো—বুড়োমতন—ঐ কি রাজা নাকি? মাথায় সোনালী মুকুট, গায়ে রামধনু রঙের জামা আর মাটিতে লুটোচ্ছে ধবধবে সাদা দাড়ি।

চোখে চোখ পড়তেই বুড়ো লোকটি হাত নেড়ে ডাকলো দর্জি আর স্যাকরাকে। পায়ে পায়ে দর্জি আর স্যাকরা এগিয়ে গেলো বুড়ো লোকটির দিকে। ক্ষুদে লোকগুলো এবার তাদের দুজনকে ঘিরে গোল হয়ে নাচতে শুরু করলো টিকিটি টা—টিকিটি টিকিটি টিকিটি টা, টাকুটি টাকুটি টা। নাচ যখন বেশ জমে উঠেছে তখন হঠাৎ বুড়ো লোকটি দুহাতে তালি বাজালেন—থাম্। নাচগান সব নিমেষে থেমে গেলো। কোথাও কোনো আওয়াজ নেই।

গলা ঝেড়ে বুড়ো বললেন, “আমি হলাম বনপরীদের রাজা, আয় এদিকে। বোস্ এখানে। এই ওক গাছের গুঁড়ির ওপরে বোস্।” এই না বলে বুড়ো পরীরাজা তার রামধনু রঙা জামার ভেতর থেকে একটা ধারালো ক্ষুর বের করলেন। বেচারা স্যাকরা আর দর্জি কিছু বোঝার আগেই ক্ষুর দিয়ে ঘষঘষ ঘষঘষ করে রাজা দুজনের মাথা দিলেন ন্যাড়া করে। তারপর খুশী হয়ে ওদের পিঠ চাপড়ে বললেন, “থিক্ থিক্ থিক্ – যা এবার পকেটে পুরে যত পারিস্ কয়লা নিয়ে যা। ঐ ওখান থেকে। যাঃ চট্পট্ যা।” বুড়ো রাজার আঙুল বরাবর তাকিয়ে দর্জি আর স্যাকরা দেখলো পাশেই বেশ বড়োসড়ো এক কয়লার পাহাড়। কিন্তু কয়লা নিয়ে কী করবে তা তারা ভেবেই পেলো না।

রাজার দিকে তাকাতেই ওরা দেখলো রাজার হাতে ধরা ধারালো ক্ষুরটা চাঁদের আলোয় চক্চক্ করছে আর ওদের দিকে চেয়ে রাজা মিটিমিটি হাসছেন। ভয়ের চোটে তড়িঘড়ি পকেটে যতটা পারলো কয়লা ভরে দুজনে বেরিয়ে পড়লো ঐ অদ্ভুত জায়গা ছেড়ে।

পাহাড় পেরিয়ে এসে জঙ্গলের শেষ মাথায় ছোট্ট এক সরাই-খানায় ওরা রাতের মতো আশ্রয় নিলো। সারাদিনের ক্লান্তির পর বিছানায় শোয়া মাত্রই ওদের দুচোখে নেমে এলো গভীর ঘুম।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে ঘটলো আরও আজব সব কাণ্ড। ঘুম ভেঙে ন্যাড়া মাথায় হাত বুলতে গিয়ে দর্জি চেঁচিয়ে উঠলো, “এই, এই – এ কি স্বপ্ন দেখছি নাকি? কাল ন্যাড়া মাথায় শুলাম আর আজ রাতারাতি সব চুল কিনা আবার গজিয়ে গেলো। একি ভুতুড়ে ব্যাপার নাকি? – ও ভাই স্যাকরা, আরে, দেখো না ভাই আমাকে চিম্‌টি কেটে আমি জেগে আছি কিনা।”

“অ্যাঁ?” তড়াক করে উঠে বসলো স্যাকরা, “আরে, তাই তো। ম্যথা ভরা দিব্যি আগের মতো চুল। আর কোটের পকেটে – একী? জ্বলজ্বল করছে – চক্‌চক করছে –, এ তো কয়লা নয়? – সোনা!

আসল সোনা ! সোনা রে—” খুশীতে পাগলের মতো হাসতে শুরু করলো স্যাকরা—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ— ।

দর্জি বললো, “গাঁয়ে ফিরে গিয়ে বড়ো একটা দোকান খুলবো আমি। বাকী জীবনটা সুখে চলে যাবে। খাওয়াপরার ভাবনা আর ভাবতে হবে না। কী বলো ভাই ?”

স্যাকরা ছিলো বেজায় লোভী। লোভে তখন তার দুচোখ চক্‌চক্ করছে। সে বললো, আমি ভাই আবার যাবো আজ রাতে। হেঃ হেঃ হেঃ। বড্ড বোকামি করে ফেলেছি না বুঝে। এবার পকেট ভরে নয়, এক্কেবারে, বুঝলে কিনা, থলে ভরে কয়লা তুলে আনবো। হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ তারপর আমায় পায় কে ?—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ…। স্যাকরার হাসি আর থামে না।

শেষমেশ সে রাতে স্যাকরা আবার গেলো সেই বনপরীদের নাচের আসরে। আবার আগের রাতের মতো বুড়ো রাজার ক্ষুরে মাথা ন্যাড়া হলো তার। শুধু তাই নয় এবার পরীদের রাজা তার গোঁফদাড়ি সব কামিয়ে দিলেন ধারালো ক্ষুর দিয়ে। তারপর যেই না রাজা মিটিমিটি হেসে বললেন, “যা এবার কয়লা নিয়ে বাড়ী যা”, অমনি স্যাকরা তার মস্ত থলেতে পড়ি কী মরি করে যত পারলো ঠেসে কয়লা ভরে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এলো সরাইখানায়। সারারাত খুশীতে আহ্লাদে ভালো করে তার ঘুমই এলো না।

সকাল হতে না হতেই দর্জিকে একরকম ঠেলে তুলে দিলো স্যাকরা, “ওঠো না বন্ধু শিগ্‌গির ওঠো, আজ আমাদের বড়ো আনন্দের দিন। সোনা, সোনা, শুধু সোনা, হোঃ হোঃ হোঃ হাঃ হাঃ হাঃ…”, ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে থলে উপুড় করে দিলো স্যাকরা—ঠুক্‌ঠাক্—ঠক্‌ঠাক্—ঠকাস্। “একী সোনা কোথায় ? এ যে সব কয়লা—শুধু কালো কালো কয়লা।”

থলের ভেতর থেকে শুধু ঝরঝর করে কেবলই কয়লা বেরোতে লাগলো। লোভের ফল সে পেলো একেবারে হাতে হাতে। পাশে

পড়ে থাকা ছোটো পুঁটলিটা খুলে দেখলো আগের রাতে পাওয়া তার ভাগের সোনাগুলোও সব কয়লা হয়ে গেছে। বলে না অতি লোভে তাঁতী নষ্ট।

মাথায় হাত দিয়ে দেখলো একগাছিও চুল নেই। সখের দাড়ি গোঁফও সব উধাও। দর্জির দুহাত জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো স্যাকরা। "কেন অমন লোভ করতে গেলাম ভাই – সব গেলো, চুল গোঁফ দাড়ি গেলো, আমার সবই গেলো ভাই – উঃ – উঁ উঁ – উঁ।..."

মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে দর্জির হাত জড়িয়ে ধরে স্যাকরা কাঁদতে থাকলো আর কাঁদতেই থাকলো।

জোরিণ্ডা আর জোরিণ্ডেল

এক ঘন জঙ্গলের মধ্যে ছাইরঙা উঁচু পাথরের কেল্লায় থাকতো ভারী দুষ্টু এক ডাইনীবুড়ি। কেল্লার চারপাশে গাছপালার এমনই ঠাসা-ঠাসি যে দিনের বেলাতেও সেখানে ভালো করে আলো ঢুকতে পেতো না। লোকে বলতো ঐ দুষ্টু ডাইনীবুড়ি নাকি দিনের বেলা বেড়াল বা পেঁচার রূপ ধরে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। তারপর সূর্য অস্ত গেলে আবার নিজের চেহারা ধরে ফিরে যায় নিজের কেল্লায়। নানারকম দুষ্টু যাদু জানতো ঐ ডাইনীবুড়ি। লোকে বলতো ঐ কেল্লার একশ গজের মধ্যে কোনো ছেলে ঢুকলে ডাইনীর যাদুতে সে নাকি পাথর হয়ে যায়। আর মেয়েদের নাকি পাখী বানিয়ে খাঁচায় বন্দী করে রেখে দেয় ডাইনী ঐ কেল্লার স্যাঁতসেঁতে এক পাথরের ঘরে।

ঐ জঙ্গলের ধারে পাশাপাশি বাড়ীতে থাকতো জোরিণ্ডেল নামে এক মেষপালক আর ফুটফুটে মিষ্টি এক মেয়ে—নাম তার জোরিণ্ডা। জোরিণ্ডা আর জোরিণ্ডেল ছিলো প্রাণের বন্ধু। ভাব ছিলো ওদের গলায় গলায়। প্রায়ই ওরা দুজনে চলে যেতো জঙ্গলে ফুল তুলতে, ব্যাঙের ছাতা কুড়োতে, আবার কখনও সখনও খেলতে কিংবা শুধুই বেড়াতে। একদিন খেলতে খেলতে দু বন্ধুতে জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেললো।

সূর্য তখন ডোবে ডোবে। জোরিণ্ডা বললো, "জোরিণ্ডেল, কোথায় এলাম বল্ তো?"

জোরিণ্ডেল সাহসী ছেলে। বুক ফুলিয়ে বললো, "ভয় পাচ্ছিস্ কেন? আমি তো আছি। আর ঐ দেখ্ না—দেখ্, ঐ গাছের ফাঁক দিয়ে একটা বাড়ীর চিম্‌নি দেখা যাচ্ছে না!"

"কী জানি ভাই, আমার বড্ড ভয় লাগছে।"

"দূর বোকা,—চল্ গিয়ে ঐ গোল পাথরটার ওপর বসি।" জোরিণ্ডা আর জোরিণ্ডেল একটা উইলো গাছের নীচে মস্ত একটা

পাথরের ওপর পাশাপাশি কাছ ঘেঁষে বসলো। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। গোল থালার মতো কমলালেবুর রঙের সূর্য দূরে একটা বড়ো গাছের পেছন দিয়ে নেমে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

হঠাৎ জোরিণ্ডা বললো, "আমার ভাই বড্ড কান্না পাচ্ছে জোরিণ্ডেল। এই জঙ্গলে শুনেছি—ভারী দুষ্টু এক ডাইনীবুড়ি থাকে। আমরা ঐ ডাইনীর বাড়ীর কাছাকাছি এসে পড়লাম না তো?"

বলতে না বলতেই ওরা দেখলো মাথার ওপর দিয়ে কালো কুচকুচে একটা প্যাঁচা ফটাফট্ ফটাফট্ ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে গেলো। ভয়ে কেঁপে উঠে চোখ বুজলো জোরিণ্ডা আর জোরিণ্ডেল।

সূর্য ততক্ষণে ডুবে গেছে। ঝাপসা আলোয় জোরিণ্ডেল শুনলো পাখীর মতো মিষ্টি গলার গান—

"টুকটুকে লাল মালা গলায়
জোরিণ্ডা বুলবুলি
কেঁদো না গো, বন্ধু আমার
পথ হারিয়ে চলি—টু-ই-ই-টু্ টু্ টু্ টু্ টু্ টু-ই-ই-টু্..."

চম্‌কে ফিরে তাকিয়ে জোরিণ্ডেল দেখলো তার সাথী, ফুটফুটে মিষ্টি জোরিণ্ডা একটা ছোটো বুলবুলি পাখী হয়ে গেছে। আর তার নিজের পা দুটোও যেন দশমণ পাথরের মতো ভারী আর অবশ হয়ে গেছে—শক্ত হয়ে সেঁটে গেছে মাটিতে। এখন উপায়? নড়তে পারছে না জোরিণ্ডেল—মুখ দিয়ে কথাও তো বেরোচ্ছে না।

হঠাৎ শোঁ শোঁ করে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে গেলো মাথার ওপর দিয়ে। গা-টা শিরশির করে উঠলো জোরিণ্ডেলের। সামনে এক কাঁটাঝোপের পাতাগুলো নড়ে উঠলো খচর মচর করে।

ঝোপের পেছন থেকে বেরিয়ে এলো কালো আলখাল্লা গায়ে বিকট চেহারার এক বুড়ি। ঝোলা থুতনিটা প্রায় বুক পর্যন্ত লম্বা। ধনুকের মতো বাঁকা নাকখানা এসে ওপরের ঠোঁটটা প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে। মূলোর মতো কালো কালো দাঁত আর কুলোর মতো

কান। হাতে একটা বেতের খাঁচা। জোরিণ্ডেল বুঝলো ওরা দুষ্টু ডাইনীর খপ্পরে পড়েছে।

বুলবুলি পাখীটাকে ধরে খাঁচায় পুরে শকুনের চোখে ডাইনীবুড়ি চাইলো জোরিণ্ডেলের দিকে। মস্ত মস্ত দাঁত বের করে বিশ্রী কর্কশ গলায় বলে উঠলো,

"যাক ডুবে যাক চাঁদ
শেষ করে দিক ফাঁদ
কাতুম কুতুম কাতুম
পাথর মায়া খতম।"

এই বলে হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করে বিকট রকম হাসতে হাসতে আবার ঝোপের মধ্যে মিলিয়ে গেলো সে।

এক ফালি চাঁদটা যখন ভোর রাতে আস্তে আস্তে ডুবে গেলো তখন জোরিণ্ডেল দেখলো সে আবার কথা বলতে পারছে। পা দুটো হাল্‌কা হয়ে গেছে—আবার হাঁটতে পারছে সে। বুঝলে ডাইনীর যাদু কেটে গেছে।

ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরে এলো জোরিণ্ডেল। কেবলি মনে হতে লাগলো বেচারী জোরিণ্ডার কথা—বুলবুলি পাখী হয়ে দুষ্টু ডাইনী-বুড়ির খাঁচায় বন্দী হয়ে আছে তার প্রাণের বন্ধু জোরিণ্ডা।

পরদিন রাতে এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলো জোরিণ্ডেল। দেখলো ক্ষুদে এক বামন তাকে বলছে, "জোরিণ্ডাকে ডাইনীর হাত থেকে উদ্ধার করতে চাস্? —পারবি। মন দিয়ে শোন্। উত্তর মুখে দশ দিন দশ রাত্রি একনাগাড়ে পথ চলে এক দীঘি পাবি। সেই দীঘির ধারে দেখবি রক্তের মতো লাল রঙের এক ফুল। পাপড়িগুলোর মাঝে ফুলের বুকে দেখবি দামী মুক্তোর মতো একটা বড়ো শিশিরের ফোঁটা টলটল করছে। ঐ ফুল তুলে যদি ডাইনীর গায়ে ছোঁয়াতে পারিস্ ডাইনীর যাদুর মায়া যাবে কেটে…।"

দেরী না করে পরদিন সকালেই জোরিণ্ডেল বেরিয়ে পড়লো ঐ

মায়াবী ফুলের খোঁজে। দশ দিন দশ রাত চলার পর সত্যি এক সকালে দীঘির ধারে দেখতে পেলো ফুটে আছে লাল টকটকে রক্তরঙা এক অদ্ভুত ফুল — ফুলের মধ্যিখানে বিরাট একটা শিশির ফোঁটা টলমল করছে।

খুশীতে মনটা ভরে উঠলো জোরিণ্ডেলের। ফুলটা হাতে নিয়ে সে ফিরে চললো দুষ্টু ডাইনীবুড়ির কেল্লায়। চলতে চলতে কেল্লার ফটক পর্যন্ত পৌঁছে গেলো জোরিণ্ডেল, কিন্তু আগের মতো মাটিতে তার পা আটকে গেলো না। সাহসে বুক বেঁধে এগিয়ে চললো সে।

ফটক পার হয়ে কেল্লার ভেতরে ঢুকে জোরিণ্ডেল দেখলো উঠোনের একপাশে বসে ডাইনীবুড়ি হাজার হাজার পাখীকে দানা খাওয়াচ্ছে। ময়না, কোকিল, ফিঙে, চড়ুই, বুলবুলি···। এর মধ্যে কোন্‌টা যে জোরিণ্ডা তা কে বলে দেবে! হাজার হাজার পাখীর মধ্যে কোন্‌টা তার বন্ধু জোরিণ্ডা? এত করেও শেষ পর্যন্ত জোরিণ্ডাকে সে উদ্ধার করতে পারবে না?

হঠাৎ জোরিণ্ডেলের দিকে চোখ পড়তে ডাইনীবুড়ির মাথায় আগুন জ্বলে উঠলো। নাক দিয়ে এমন জোরে তার নিশ্বাস পড়তে লাগলো যেন ঝড় বইছে। রক্তলাল মায়াবী ফুলটা শক্ত করে হাতে ধরে রইলো জোরিণ্ডেল। তার কাছে আসতে পারলো না ডাইনী-বুড়ি। দূরে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড রাগে গজরাতে লাগলো সে — মস্ত মস্ত কালো দাঁত কিড়মিড় করতে লাগলো। তারপর হঠাৎ কী ভেবে ছোঁ মেরে তুলে নিলো একটা বেতের খাঁচা।

"ঐ তো খাঁচার ভেতরে ওটা বুলবুলি পাখী না? — হ্যাঁ ঠিক ধরেছে সে। ঐ খাঁচার মধ্যেই তাহলে আছে জোরিণ্ডা। ··· নাঃ দুষ্টু ডাইনীবুড়িকে ছেড়ে দিলে চলবে না। হাতে তো ফুলটা আছে। ভয় কি?" — উঠোনে পা বাড়ালো জোরিণ্ডেল।

খাঁচা হাতে উঠোন থেকে ঝড়ের বেগে নামতে গেলো ডাইনী আর বিশাল আলখাল্লাটা পায়ে বেঁধে হুড়মুড় করে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো মাটিতে।

'এই সুযোগ'—ছুটে গিয়ে জোরিণ্ডেল লাল ফুলটা ছুঁইয়ে দিলো বুড়ির গায়ে। একটা কেঁচো হয়ে মাটিতে কুঁকড়ে পড়ে রইলো ডাইনীবুড়ি।

পাখীগুলো আবার দেখতে দেখতে সব মানুষ হয়ে গেলো। হাজার হাজার খাঁচা থেকে বেরিয়ে এলো হাজার হাজার মেয়ে। খুশীতে হাততালি দিয়ে জোরিণ্ডেলকে ঘিরে ধরলো তারা। জোরিণ্ডা ছুটে এসে জোরিণ্ডেলের দু হাত ধরলো। হাত ধরে ওরা দুজন ছুটে চললো বনবাদাড় পেরিয়ে ওদের গাঁয়ের দিকে।

বারো রাজকুমারী

এক রাজার ছিলো বারোজন অপরূপ সুন্দরী মেয়ে। একদিন রাজার কানে খবর এলো প্রত্যেকদিন বারো রাজকন্যা নতুন জুতো কেনে। একদিন নয় ছুদিন নয়, একমাস, ছুমাস পরপর তিনমাস গেলো রোজ একই কাণ্ড। রোজ রোজ রাজকুমারীদের জন্যে আসে নতুন জুতো আর রোজ সকালে দেখা যায় বারো রাজকন্যার খাটের পাশে বারো জোড়া নতুন জুতো সুকতলা ক্ষয়ে ছিঁড়ে পড়ে আছে। কেমন করে যে এমন কাণ্ড হয় কেউ জানে না। রাজকন্যাদের জিজ্ঞেস করলে তারা বলে, "সত্যি তো অবাক কাণ্ড। কী করে যে জুতো-গুলোর এমন দশা হয় আমরা জানতেও পারি না।"

রাজামশাই পড়লেন মহা চিন্তায়। রাজ্যে খবর রটিয়ে দিলেন তিনি—যে এ রহস্য ভেদ করতে পারবে তার সঙ্গে তিনি বিয়ে দেবেন যে-কোনো এক রাজকন্যার। সেই সঙ্গে তাকে দেবেন তাঁর অর্ধেক রাজত্ব।

কত বড়ো বড়ো রাজা এলেন। এলেন কত রাজপুত্র, সদাগরপুত্র উজির, নাজির। আরও কত বড়ো বড়ো সব যোদ্ধা, এলো আরও কত লোক। কিন্তু কেউই এ রহস্য ভেদ করতে পারলো না। এমনি করে দেখতে দেখতে গোটা একটা বছর গড়িয়ে গেলো।

একদিন খবর গিয়ে পৌঁছলো ভিনদেশী এক সৈনিকের কানে। সৈনিক ঠিক করলো সে একবার চেষ্টা করে দেখবে। ভাবতে ভাবতে চললো সে রাজবাড়ীর দিকে। তখন সন্ধের অন্ধকার আবছা হয়ে নেমেছে। চলতে চলতে চলতে চলতে হঠাৎ কোথা থেকে পথে এসে দাঁড়ালো থুত্থুড়ে এক কুঁজো বুড়ি। বুড়ি বললো, "তা বাছা এদিকে চললে কোথায় ?"

সৈনিক বললো, "চলেছি রাজবাড়ীর দিকে বুড়িমা। দেখি যদি বের করতে পারি প্রতি রাতে কী করে বারো রাজকুমারী তাদের বারো জোড়া নতুন জুতো ছেঁড়েন।"

মাথা নাড়লো কুঁজো বুড়ি, "হুঁ — কঠিন কাজ। সে বড়ো কঠিন কাজ বাছা। তবে ভয় পেয়ো না তুমি। আমি তোমায় সাহায্য করবো। তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। যা বলি চুপটি করে বসে শোনো মন দিয়ে।" — এই না বলে এক ঝট্‌কায় বুড়ি তার কোটের ভেতর থেকে বের করলো কালো এক আলখাল্লা। সৈনিকের হাতে সেটা দিয়ে বুড়ি বললে, "এই নাও বাছা। এই আলখাল্লাটা পরলে তুমি একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে কেউ তোমাকে দেখতে পাবে না। আর তুমিও চুপি চুপি রাজকুমারীদের পিছু নিতে পারবে।"

"বুড়িমা, কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ..."

"দাঁড়াও বাছা, কথা আমার এখনও শেষ হয়নি। একটা কথা মনে রেখো। রাজকুমারীদের দেয়া কোনো খাবার বা সরবত কক্ষনো খাবে না। ভুলো না যেন..."

বলে, যেমন এসেছিলো তেমনই হঠাৎ অন্ধকারে ঝোপের আড়ালে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো সেই কুঁজো বুড়ি।

চলতে চলতে সৈনিক এসে হাজির হলো রাজবাড়ীতে। রাজা বললেন, "ভেবে দেখো সৈনিক। তোমার মতো কত লোক এসেছে আগে। কত রাজা, রাজপুত্র চেষ্টা করেছে এই রহস্য ভেদ করতে। কেউ পারে নি। কেউ না।"

সৈনিক বললো, "আপনি যদি অনুমতি দেন রাজামশাই—আমি একবার চেষ্টা করে দেখিই না।"

রাজা খুব একটা উৎসাহ দেখালেন না কিম্বা খুশীতে ডগমগও হয়ে উঠলেন না। কেবল বললেন, "বেশ যাও।"

সৈনিক রাতের বেলা কিছুই খেলো না। বড়ো রাজকুমারী নিজের হাতে সোনার রেকাবীতে করে সাজিয়ে আনলো নানা রকমের ফলমূল। রুপোর গেলাসে এনে দিলো আঙুরের মিষ্টি রস। রাজ-কন্যাদের চোখের আড়ালে চুপি চুপি সব দেখেছিলো সৈনিক। তারপর রাজকুমারীদের সঙ্গে খানিক গল্পগুজব করে বিছানায় শুয়ে পড়লো সে। একটুপরেই বেশ জোরে নাক ডাকাতে আরম্ভ করলো সৈনিক—ঘড়র ঘর—র ঘড়র—ঘর—র—যেন সে কত ঘুমুচ্ছে।

সৈনিকের নাক ডাকা শুরু হতেই খিলখিল করে হেসে উঠলো বড়ো রাজকুমারী, "আঙুরের রসে মেশানো ওষুধ কাজ শুরু করেছে ভাই—হিঃ হিঃ হিঃ চল্ পোষাক পরে নে সব।"

খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো বাকী দশজন রাজকুমারী। হেসে এ ওর গায়ে ঢলে পড়লো ওরা। হাসলো না কেবল সবচেয়ে ছোটো রাজকুমারী। মুখ কাঁচুমাচু করে সে বললো, "আমার কেন জানি আজ বড়ো ভয় করছে রে।"

"দূর বোকা, ভয় কি ?" মেজো রাজকুমারী বললো, "দেখছিস না ভোঁস ভোঁস করে কেমন দিব্যি ঘুম দিচ্ছে সৈনিক ? নে নে চল্। তাড়াতাড়ি পোষাক পরে নে।"

নাচের পোষাক পরে, সেজেগুজে, নতুন জুতো পায়ে দিয়ে তৈরী হলো বারো রাজকুমারী। বড়ো রাজকুমারী তার বিছানার ওপর

দাঁড়িয়ে হাতে তিন তালি দিতেই অমনি চিচিং ফাঁক—খাটের সামনের মেঝেটা সরে গেলো সরসরিয়ে। আর চোরা পথ বেয়ে মাটির নীচে নামতে লাগলো একে একে বারোজন রাজকন্যা।

সৈনিক এতক্ষণ পড়েছিলো মট্‌কা মেরে। একটুও ঘুমোয়নি সে। এইবার তড়াক করে লাফিয়ে উঠে সেই বুড়ির দেয়া কালো আলখাল্লাটা গায়ে চাপিয়ে সে-ও রাজকন্যাদের পিছু নিলো। আল-খাল্লাটা পরামাত্র সৈনিক অদৃশ্য হয়ে গেছে। সে বুঝতে পারলো রাজকুমারীরা তাকে দেখতে পাচ্ছে না। হাসতে হাসতে গল্প করতে করতে তরতরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামছে তারা। সবার আগে বড়ো রাজকুমারী আর সবশেষে ছোটো রাজকুমারী। তাড়াহুড়োতে অসাবধানে হঠাৎ সৈনিকের আলখাল্লায় পা জড়িয়ে গেলো ছোটো রাজকুমারীর। ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো সে। বড়ো রাজকুমারী ধমক দিয়ে উঠলো তাকে, "তোর আজ হয়েছেটা কী বল্‌ তো? সেই প্রথম থেকেই যেন ভয়ে সিঁটিয়ে আছিস্‌।"

ছোটো রাজকুমারী বললো, "কী জানি রে, আমার আজ একটুও ভালো লাগছে না। কোথাও কিছু নেই অথচ কিসে যে পা-টা জড়িয়ে গেলো ভেবেই পাচ্ছি না।"

"ও সব তোর মনের ভুল। চল্‌ চল্‌।" তাড়া লাগালো সেজো রাজকুমারী। একশোখানা সিঁড়ি বেয়ে নেমে ওরা পৌঁছলো পাতালপুরীর অপূর্ব সুন্দর এক বাগানে। সেখানে সোনার গাছে ঝিকমিক করছে ঝলমলে রুপোর পাতা, গাছের ডালে ডালে ফুটে আছে মুক্তোর ফুল, ঝুলছে হীরেমণিমাণিক্যের ফল। রঙের ছটায়, সোনা-রুপোর ঝিকিমিকিতে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। সৈনিক পটাপট কিছু ফুল, ফল আর পাতা ভেঙে নিলো গাছের ডাল থেকে। তারপর চোখের নিমেষে সেগুলো ভরে নিলো আলখাল্লার পকেটে। রাজা-মশাইকে প্রমাণ দেখাতে হবে তো।

কিন্তু চম্‌কে উঠলো ছোটো রাজকুমারী। বড়ো বোনের গোলাপী

রঙের কুচি দেয়া জামার আস্তিন ধরে আলতো করে টান দিলো সে। “শুনলি, শুনলি ? পটাপট পটাপট কিসের আওয়াজ ?”

বড়ো রাজকুমারী বললো, “কই, কোথায় ? আমি তো কিছুই শুনি নি। যতসব বাজে ভাবনা ছেড়ে আয় তো তাড়াতাড়ি।”

বাগান ছাড়িয়ে টলটলে রুপোলী জলের এক দীঘি। সেখানে বারোখানা দুধের ফেনার মতো সাদা, রাজহাঁসের মতো দেখতে নৌকো নিয়ে দাঁড়িয়েছিলো বারোজন রাজপুত্র। ভারী সুন্দর তাদের চেহারা। গায়ে তাদের জমকালো সোনা-রুপোর পোষাক। বারো রাজকুমারী টপাটপ উঠে পড়লো বারোখানা রাজহাঁস নৌকোয়। সৈনিকও একলাফে বসলো গিয়ে ছোটো রাজকুমারীর নৌকোতে।

ছোটো রাজকুমারীর হঠাৎ কেমন শীত করে উঠলো। গায়ে কাঁটা দিলো তার। মনে হলো নৌকোটা আজ অন্য সবদিনের চেয়ে ভারী, কিন্তু চুপ করে বসে রইলো সে। দু-দুবার বোনেদের কাছে বকুনি খেয়েছে আজ।

নৌকোগুলো থামলো গিয়ে দীঘির অপর পাড়ে পাতালপুরীর বিরাট এক নাচঘরের সামনে। সেখানে স্ফটিকের মেঝের ওপর স্ফটিকের ঝাড়বাতির নীচে ঐ বারো রাজপুত্রের সঙ্গে বারো রাজকুমারী নাচলো ভোররাত পর্যন্ত। নাচতে নাচতে যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের জুতোর তলা একেবারে ক্ষয়ে ছিঁড়ে গেলো ততক্ষণ অবধি নাচ থামালো না তারা। আলখাল্লার গুণে সৈনিককে ওরা কেউ দেখতে পেলো না।

ক্লান্ত রাজকন্যারা প্রাসাদে ফেরার আগেই সৈনিক ফিরে এলো ঘরে। তারপর কম্বলমুড়ি দিয়ে গুটিসুটি বিছানায় শুয়ে পড়লো সে।

পরদিন সৈনিকের মুখে সব কথা শুনে রাজামশাই ডেকে পাঠালেন রাজকুমারীদের।

“এ সব কি সত্যি ?”

সৈনিক প্রমাণ পর্যন্ত হাজির করেছে—হীরেমণিমুক্তোর ফলফুল,

রুপোর পাতা, সব। রাজকুমারীরা ধরা পড়ে গেছে। এখন মিথ্যে বলে লাভ কি?

ঘাড় নেড়ে বারো রাজকন্যা বললো, "হ্যাঁ।"

তারপর আর কি? সৈনিক বললো, "বয়স তো আমার খুব কম নয়। বড়ো রাজকন্যাকেই আমার বৌ হিসেবে মানাবে ভালো। সৈনিকের সঙ্গে মহা ধূমধাম করে বড়ো রাজকন্যার বিয়ে দিয়ে দিলেন রাজা। আর অর্ধেক রাজত্ব পেয়ে সুখে দিন কাটাতে লাগলো তারা।
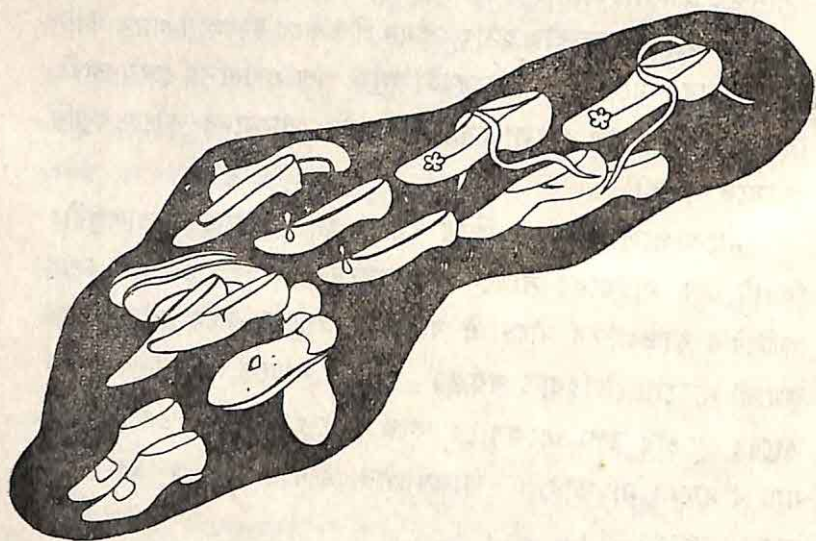
তুই বামন

এক গাঁয়ে থাকতো খুব গরীব এক মুচি আর তার বৌ। সেই সকাল থেকে রাত্তির অবধি খেটেখুটে সামান্য যে-কটা পয়সা মুচি রোজগার করতো, তা দিয়ে তুজনে তুবেলা পেট ভরে তুটো খেতেও পেতো না। ভারী কষ্টে দিন কাটাতো তারা।

এক রাতে মুচি, মুচি-বৌকে বললো, "আর আমার জুতো সেলাই করার চামড়া নেই বৌ। যা ছিলো সব ফুরিয়েছে। বাকী আছে কেবল একজোড়া জুতো বানাবার মতো চামড়া। এই জুতোজোড়া বানিয়ে কাল সকালে যদি বেচতে পারি, তবেই নতুন চামড়া কিনে আবার জুতো সেলাই করতে পারবো। তা না হলে কালকের পর কী যে খাবো, আর কী যে হবে কে জানে।"

মুচি-বৌ বললো, "অতশত ভেবো না। যা আমাদের কপালে আছে তাই হবে। কাজকর্ম সেরে তাড়াতাড়ি বরং শুয়ে পড়ো গিয়ে। আজ কেমন হাড়-কাঁপানো শীত পড়েছে দেখছো না?"

বাইরে সত্যি উত্তুরে হাওয়া বইছে শোঁ-শোঁ করে। পেঁজা তুলোর মতো গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ বৃষ্টিও হচ্ছে। ঘরে আগুন জ্বালবার কাঠ সব শেষ। কনকনে শীতে মুচি আর মুচি-বৌয়ের দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি লাগছে। ঠাণ্ডায় হাত-পা জমে যাবার যোগাড়। এক জোড়া জুতোর চামড়া কেটে টেবিলে সব ঠিকঠাক করে গুছিয়ে রেখে মুচি বললো, "নাঃ, এই শীতে আজ আর কাজ করা যাবে না। কাল বরং ভোর সকালে উঠেই কাজে লেগে যাবো।"

পরদিন ঘুম থেকে উঠে কাজে বসতে গিয়ে মুচি তো অবাক। —একী? কাটা চামড়া তুটো সেলাই করে সুন্দর একজোড়া জুতো রাতারাতি কে বানিয়ে গেলো? একি সত্যি—নাকি স্বপ্ন দেখছে সে! এই তো কাল রাতেই তু পাটি জুতোর চামড়া কেটেকুটে ঠিক করে এই টেবিলের ওপর—এইখানে—হ্যাঁ—এইখানেই তো রেখে শুতে
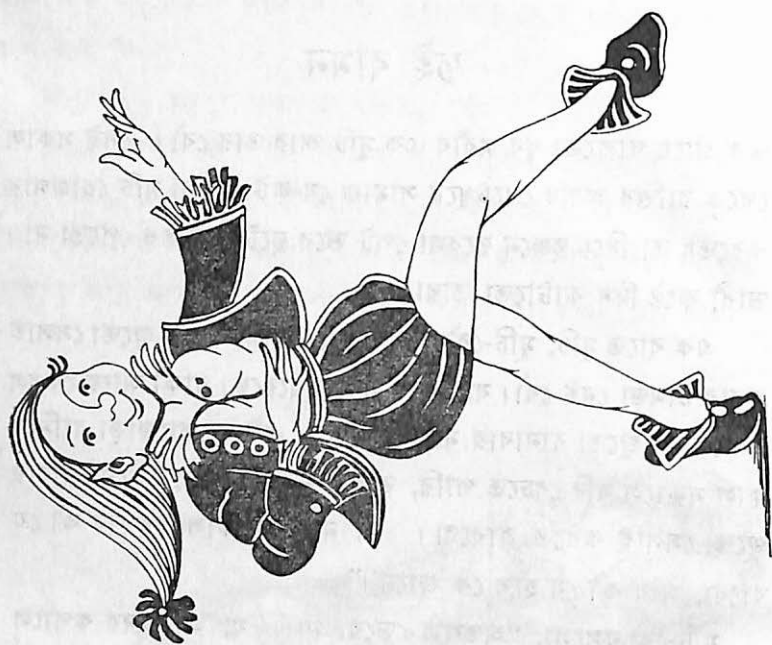
গিয়েছিলো সে। এ কি ভোজবাজি নাকি? —না না সে নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছে। নিজের হাতে একটা চিমটি কাটলো জোরে—'উফ্'—না সে জেগেই তো আছে। তাহলে স্বপ্ন নয়, সত্যি। বারবার চোখ রগড়ে রগড়ে দেখলো মুচি। ঐ তো টেবিলের ওপর চমৎকার এক জোড়া জুতো। এমন নিখুঁত সেলাই, এমন সুন্দর ডিজাইন মুচি আগে কখনও দেখে নি। পড়ি কি মরি সে দৌড়লো রান্নাঘরের দিকে। —"ও বৌ, বৌ—শিগ্গিরি এসো, দেখে যাও কাণ্ড। দেখে যাও কাণ্ড।" মুচি-বৌ-ও অবাক। দু চোখে তার পলক পড়ে না। কোনো মতে সে বললো, "এমন কাণ্ড জন্মে শুনি নি বাপু।"

দুপুরের দিকে সেদিন এক সদাগর এসে ঐ জুতোজোড়া কিনে নিয়ে গেলো দু ডবল দাম দিয়ে। মুচি বললো, "হুজুর এত দাম দিচ্ছেন কেন? এ জুতোর দাম এত বেশী তো নয়।"

সদাগর কিছুতেই শুনবে না, বললো, "না না এ দাম তোমাকে নিতেই হবে। জুতোজোড়া ভারী পছন্দ হয়েছে আমার।"

ঐ পয়সা দিয়ে মুচি সেদিন দু জোড়া জুতো বানাবার চামড়া কিনলো। তারপর রাতের বেলা চার পাটি জুতোর চামড়া কেটেকুটে টেবিলের ওপর গুছিয়ে রেখে শুতে গেলো সে। সে রাতেও ঘটলো আবার সেই একই কাণ্ড। পরের দিন সকালে ঘুম ভেঙে মুচি আর মুচি-বৌ আবার অবাক হয়ে দেখলো কালো আর শাদা চমৎকার দু-জোড়া জুতো কে যেন রাতারাতি নিখুঁতভাবে সেলাই করে রেখে গেছে। সেদিনও মুচি ঐ দু জোড়া জুতো খুব ভালো দামে বিক্রি করলো।

এরপর প্রতি রাতে ঘটতে লাগলো একই ঘটনা। এক মাসের মধ্যে মুচির টাকাপয়সার আর কোনো কষ্টই রইলো না।

একদিন রাতে আগুন পোয়াতে পোয়াতে মুচি-বৌ বললো, "এ ভারী অবাক কাণ্ড। রোজ রোজ রাতে কে এসে এভাবে জুতো বানিয়ে যায় বলো দেখি?"

মাথা চুলকে মুচি বললো, "আমিও তো তাই ভাবি। কিন্তু ভেবে ভেবে যে কূলকিনারা কিছুই পাই না। তবে সে যেই হোক্‌-না-কেন তার দয়াতে আজ আমাদের তুঃখ-কষ্ট ঘুচেছে। কী বলো গিন্নী?"

"সে কথা আর বলতে? তবে কার দয়ায় আজ আমাদের ভাগ্য খুলে গেছে তা জানতে আমার ভারী ইচ্ছে হয়। আমি বলি কি—কে এই দয়ালু মানুষ, চলো-না আজ জেগে থেকে আমরা চুপিচুপি দেখি।"

"হুঁ, এটা মন্দ বলো নি তুমি।"

সে রাতেও মুচি জুতোর চামড়া কেটে টেবিলে সাজিয়ে রাখলো রোজ রাতের মতো। তারপর পর্দার আড়ালে সে আর তার বৌ লুকিয়ে রইলো চুপটি করে। ঢং-ঢং-ঢং-ঢং—ঘড়িতে রাত বারোটা বাজলো। সামনের দরজাটা খুলে গেলো—ক্যাঁচ করে। ঝাপটা দিয়ে হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকলো ঘরের মধ্যে। দরজা ঠেলে ঢুকলো তুই ক্ষুদে বামন। খালি গা—"খালি পা শীতে তারা কাঁপছে হি-হি করে। ঘরে ঢুকেই তারা তরতরিয়ে উঠে গেলো টেবিলের ওপরে। তারপর মোমবাতি জ্বালিয়ে ছুঁচ-সুতো নিয়ে বসে গেলো জুতো সেলাই করতে। লাল, হলুদ, কালো, শাদা চোখের নিমেষে একটার পর একটা জুতো সেলাই করে চললো ক্ষুদে তুই বামন। তারপর সব জুতো শেষ করে দরজা খুলে পথের অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে গেলো তারা।

বড়দিন আসতে আর মাত্র দিনকয়েক বাকী। মুচি-বৌ বললো, "আহা বেচারা, ওদের গায়ে না আছে জামা, পায়ে না আছে জুতো। শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে ওরা তুজন। অথচ ওদের দয়াতে আজ আমাদের কোনো অভাবই নেই। এসো-না—বড়োদিনে ওদের আমরা সুন্দর সুন্দর জামাকাপড় উপহার দিই।"

"ঠিক বলেছো গিন্নী, খুব ভালো হবে—সে খুব ভালো হবে।"

ওদের জন্যে মুচি-বৌ বানালো সুন্দর সবুজ জামা, সবুজ পশমের প্যান্ট, কালো কোট কালো পশমের মোজা, দস্তানা আর লাল

টুকটুকে পশমের টুপি। মুচি বানালো দু জোড়া ভারী সুন্দর শুঁড়-তোলা লাল টুকটুকে চামড়ার জুতো।

দেখতে দেখতে এসে গেলো বড়দিনের রাত। সে রাতে টেবিলের ওপর কাটা চামড়া না রেখে উপহারগুলো সুন্দর করে সাজিয়ে রাখলো মুচি আর মুচি-বৌ। তারপর ওরা লুকিয়ে রইলো পর্দার আড়ালে। ঘড়িতে ঢং-ঢং করে যেই রাত বারোটার ঘণ্টা বাজলো অমনি খুলে গেলো সামনের দরজার পাল্লাদুটো। বাইরে তখন ঝরঝর ঝরঝর করে বরফ পড়ছে। উত্তুরে হাওয়ার সঙ্গে একরাশ তুলোর মতো বরফ নিয়ে ঘরে ঢুকলো সেই ক্ষুদে দুই বামন। খালি গা – খালি পা। শীতে কাঁপছে থরথর করে। ঢুকেই তারা দুজনে আঁতিপাঁতি করে খুঁজতে লাগলো জুতো সেলাই করার চামড়া।

তারপর হঠাৎ তাদের চোখ পড়লো টেবিলের এক পাশে রাখা ছোট্ট ছোট্ট সুন্দর উপহারগুলোর দিকে। তারা একটা একটা করে পরলো জামা, কোট প্যাণ্ট, মোজা জুতো, টুপি দস্তানা। ঘুরেফিরে দেখতে লাগলো একজন আরেকজনকে। তারপর আনন্দে আহ্লাদে টেবিলের ওপর তিড়িং বিড়িং লাফাতে লাগলো দুই বামন। দু হাত তুলে নাচতে লাগলো ওরা, গাইতে লাগলো,

"নাধিন নাধিন ধিন
আজকে বড়দিন
গায়ে জামা পায়ে জুতো
তাক ধিনা-ধিন ধিন।
তাইরে নাইরে নাই
এখন ভাবনা কিছু নাই
জুতো সেলাই করবো না ভাই
আয় রে নাচি গাই।
সুরে সুরে ঘুরে ঘুরে
আয় রে নাচি গাই।..."

গাইতে গাইতে, হাত ধরাধরি করে নাচতে নাচতে দুই ক্ষুদে বামন দরজা খুলে অন্ধকার শীতের রাতে কোথায় মিলিয়ে গেলো।

মুচি আর মুচি-বৌ ওদের আর কোনোদিন দেখে নি। আর কোনোদিন ওরা মুচির বাড়ীতে আসে নি জুতো সেলাই করতে। তবে তার জন্য মুচি কোনোদিন দুঃখ করে নি। জীবনের শেষদিন অবধি জুতো বানিয়ে আর জুতো বেচে সুখে দিন কাটিয়েছিলো ওরা।

—
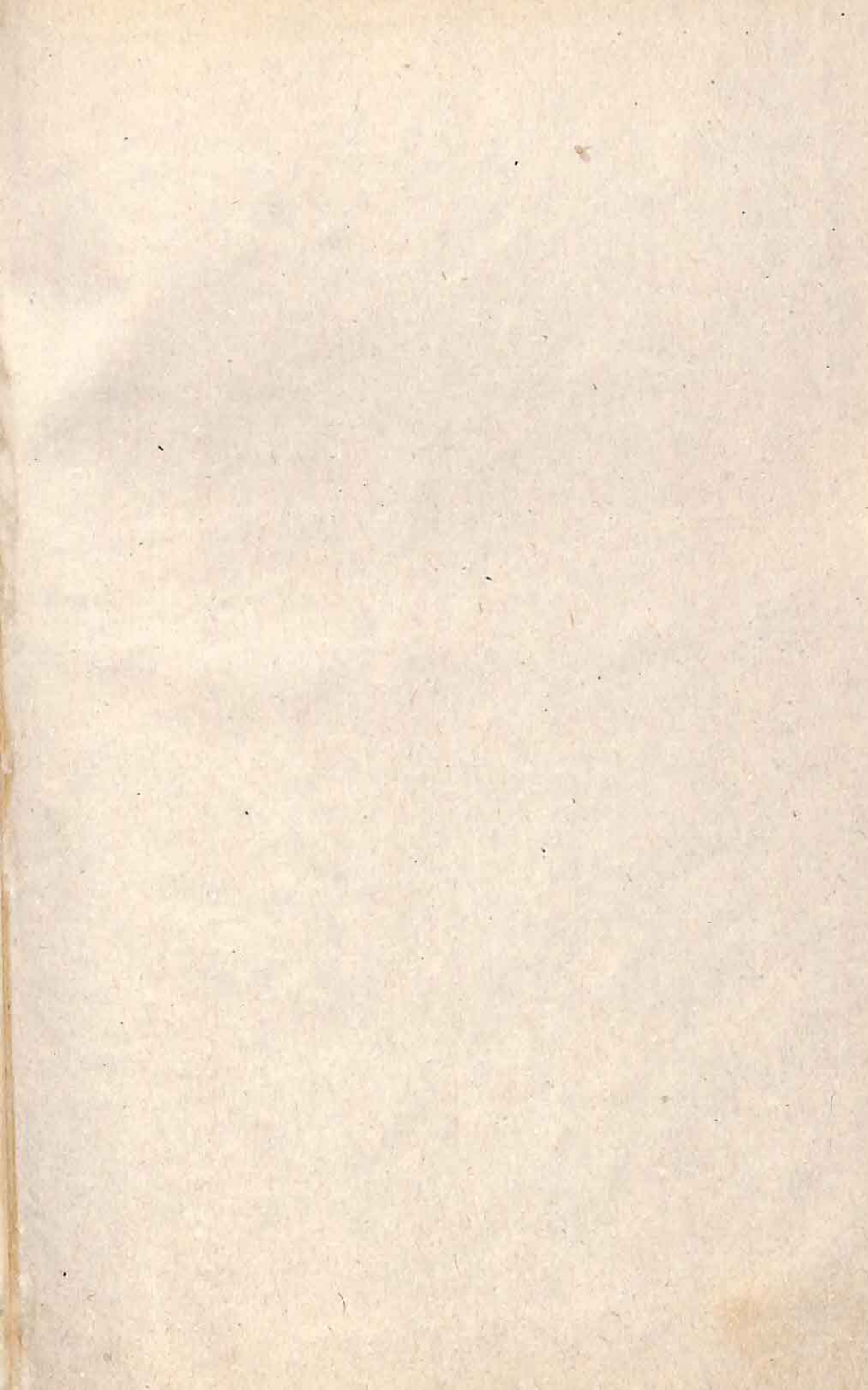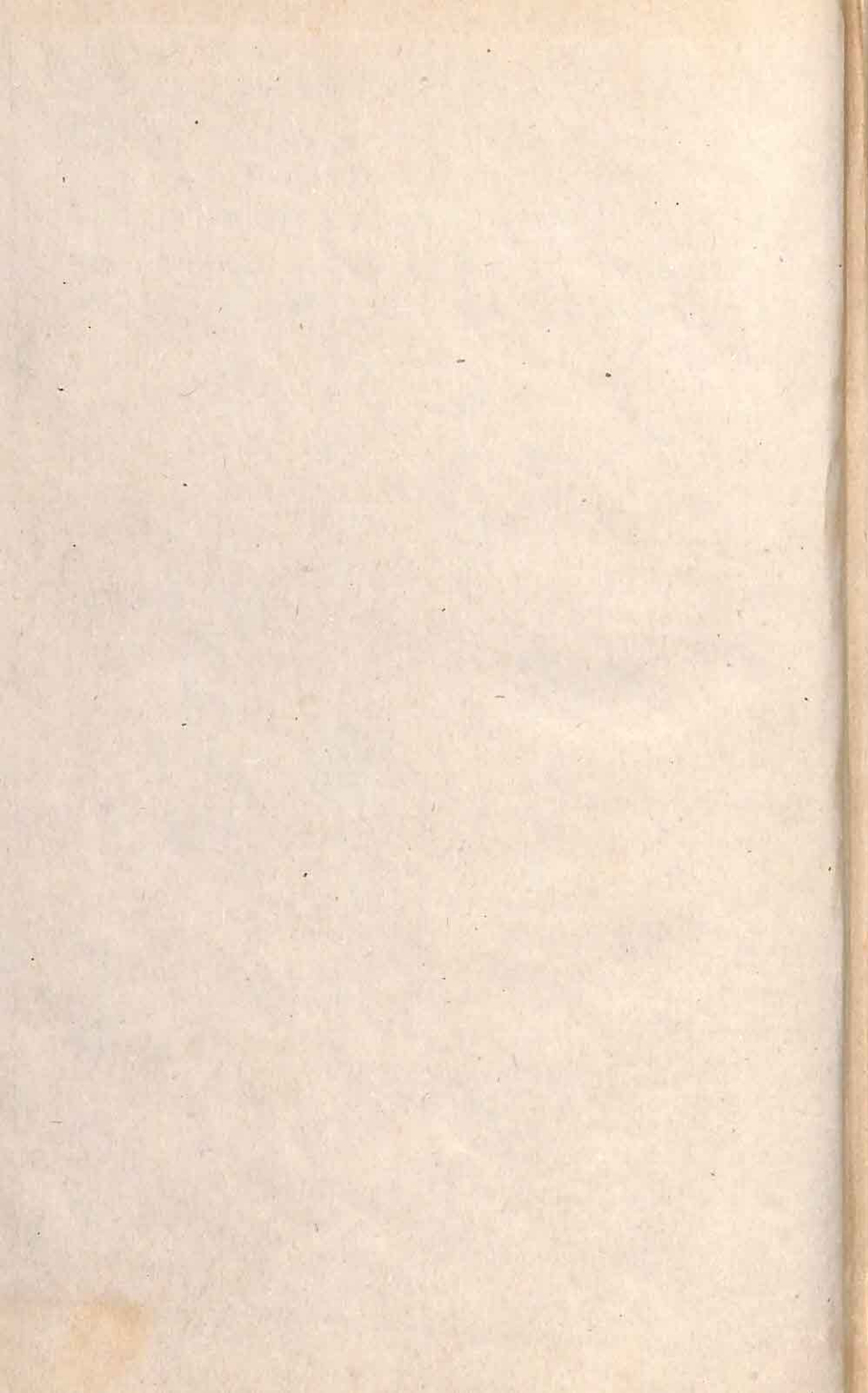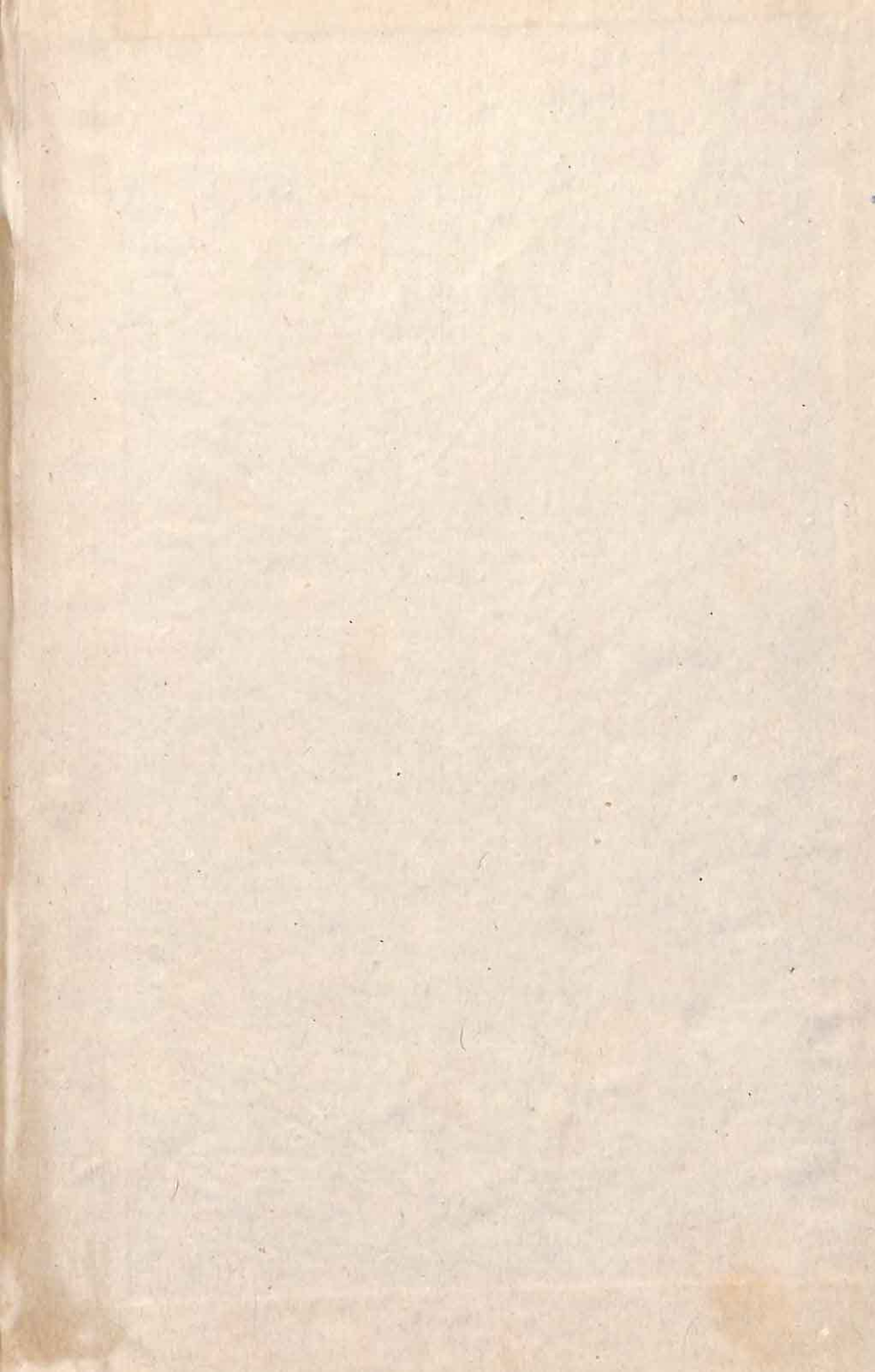
মানসী বড়ুয়া

জন্ম শিলং-এ, বড়ো হয়েছেন কলকাতায়। প্রপিতামহ সর্বজনশ্রদ্ধেয় ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস, যাঁর অন্যতম কীর্তি কলকাতার ন্যাশানাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। পড়াশোনা করেছেন কলকাতার ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে। দীর্ঘদিন বাস করছেন ইওরোপে। দায়িত্বপূর্ণ পদে কর্মরত আছেন বৃটেনের বৈদেশিক উন্নয়ন দপ্তরে। ইংল্যাণ্ডের সংস্কৃতি জীবন এবং বিবিসি বাংলা বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে দুই সংস্কৃতির ধারার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ। বিবিসি বাংলা বিভাগের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দীর্ঘকাল ধরে নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করে আসছেন, ছোটোদের অনুষ্ঠান 'কাকলি'তে অনেকদিন ধরে ক্ষুদে ক্ষুদে শ্রোতাদের শুনিয়ে আসছেন তাঁর রূপান্তরিত ইওরোপের রূপকথা। রূপকথা নিয়ে চর্চা করেছেন বহুদিন। বেতারের সীমার বাইরে লণ্ডনের ইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদেরও সামনে বসিয়ে গল্প শোনানোর সরাসরি সংযোগের অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছেন। ছোটোদের জন্যে তিনি ছবি আঁকতে ভালোবাসেন। 'ভিন্‌দেশী রূপকথা' নামে তাঁর রূপকথার একটি বই কয়েকবছর আগে প্রকাশিত হয়েছে ঢাকা থেকে।